পরিবর্তন

মনোরঞ্জন ঘোষ

ষ্টুডেন্টস বুক সাপ্লাই
১৫, কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা

পরিবর্তন

দ্বিতীয় প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৬০

দাম দু টাকা

STATE CENTRAL
ACCESSION NO.......
DATE.......

প্রচ্ছদ

মণীন্দ্র মিত্র

[গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশক : স্টুডেন্টস্ বুক সাপ্লাই
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
মুদ্রাকর : গোসাইচরণ দাস, রূপশ্রী প্রেস,
[illegible] কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

চৈতালী, জ্ঞানরঞ্জন ও কৃষ্ণা,

আমার বিরুদ্ধে তোমাদের সব চেয়ে বড় অভিযোগ দূরে থাকলে পত্র না লেখা আর কাছে গেলে গল্প না বলা। তোমাদের ধারণা আমি মোটেই গল্প বলতে পারি না। অথচ আমার বাল্যবন্ধুরা জানে ছেলেবেলায় আমার অসাধারণ গল্প বলার ক্ষমতা ছিল। তারা লেখাপড়া ও খেলাধুলা দুই ত্যাগ করে আমার গল্প শুনতো। বড় হয়ে আজ দেশের সব ছেলেদের গল্প শোনাবার চেষ্টা করেছি ছায়াছবি দিয়ে। প্রবাসে থাকার ফলে তোমরা সেই ছায়াছবি দেখতে পাওনি। তোমাদের মত বঞ্চিতদের কথা ভেবেই কাহিনীটি বই করে বের করলাম।

দিলাম তোমাদেরই হাতে।

টালিগঞ্জ

শ্রীপঞ্চমী ১৩৫৬

দাদা

॥ লেখকের আর একটি উপন্যাস ॥

চট্টগ্রাম-বিপ্লব—৩

যে-বই সরকার আটক করেছিল এবং যে-বইয়ের
ছবি তোলার অনুমতি পাওয়া যায়নি

'পরিবর্তন' সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে, প্রথমেই যাঁর কথা বলা উচিত তিনি হচ্ছেন আমার দাদা চিত্র-পরিচালক শ্রীসত্যেন বসু। এই কাহিনীর প্রতি চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর মত চিন্তা আর কেউ করেন নি।

এই কাহিনীর সার্থক ছায়াচিত্ররূপে খ্যাতি অর্জনের জন্য ধন্যবাদার্হ অনেকেই, যেমন চিত্রশিল্পী শ্রীঅজয় কর, সুরশিল্পী শ্রীসলিল চৌধুরী, সহকারী পরিচালকবৃন্দ শ্রীঅমলেন্দু বসু, শ্রীঅরুণ চৌধুরী, শ্রীসুরেশ হালদার এবং প্রতিটি শিল্পী, বিশেষ করে কিশোররা।

কর্মব্যস্ত আমাকে দিয়ে জোর করে এই কাহিনী লেখানোর কৃতিত্ব প্রাপ্য প্রযোজক বন্ধু শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায় ও বাল্যবন্ধু শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরীর। এই রচনার পিছনে প্রেরণা দিয়েছেন অভিন্নহৃদয় কবিবন্ধু শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।

ভূমিকায় আর একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ আমি করতে চাই, সেটি হচ্ছে শক্তির মৃত্যু। তার মৃত্যুর জন্য বহু অভিযোগ আমায় শুনতে হয়েছে সংবাদপত্রে, চিঠিতে ও লোকের মুখে। কারও মতে কাহিনীর মধ্যে যে প্রাণবান আদর্শ ছিল তা আমি হত্যা করেছি শক্তিকে মেরে, আবার কেউ বা বলেন সিনেমার সস্তা প্যাঁচ মেরেছি শেষের দিকে।

ছায়াচিত্রের মাধ্যমে আমার বক্তব্য হয়তো সকলের কাছে স্পষ্ট হয় নি। কিন্তু অজয়ের কৃতিত্বের পিছনে শিশিরের যে প্রচেষ্টা আছে তাকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করা হয় নি। শিশির ও শক্তি উভয়েরই প্রভাব অজয়ের জীবনে পড়েছে—একজন ধীরে ধীরে তাকে গড়েছে, আর একজন আঘাত দিয়ে তাকে বদলেছে। Evolution ও Revolution দুই-ই পরিবর্তন আনে এটি পরীক্ষিত সত্য এবং এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু সময়ের দীর্ঘতা-হ্রস্বতায়। মূল সত্যটিকে আমি নিরপেক্ষভাবে দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছি, দুয়ের কার্যকারিতার বিচারের ভার তাঁদেরই উপর ছেড়ে দিয়ে। শিশিরকে আমি শক্তির থেকে

কোথাও অক্ষম করিনি অজয়ের পরিবর্তনের কাজে। অভিযোগ যাঁরা করেছেন তাঁরা ছায়াচিত্রের montage shotগুলি সম্বন্ধে খুব সম্ভব সতর্ক থাকেন নি। দিন রাত ধৈর্য ধরে শিশির অজয়কে পড়িয়েছে; শেষ দৃশ্যে অজয় অকপটেই স্বীকার করছে 'শুধু তোর জন্য আর স্যারের জন্য আমি ভাল হয়েছি'।

অনেকে বলেন অজয়ের পরিবর্তনের মূলে শুধু শিশিরের প্রচেষ্টাই রাখা উচিত ছিল। কিন্তু শিশির পারে পড়ায় আগ্রহ জাগাতে, সাহায্য করতে; একটা পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়ার মূর্ত প্রতীক সে। একথা সত্য কোন প্রক্রিয়ায় একটি বিশেষ মানুষের সহজে পরিবর্তন হয় না; মনকে আঘাত করার প্রয়োজন হয়। গল্পের নায়ক হিসাবে অজয়কে বেশ অসাধারণ করেই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং অসাধারণ বলেই তার পরিবর্তনের আয়োজন করা হয়েছে একটু অসাধারণ ভাবে। সাধারণ দুষ্টু ছেলে রবি-রূপ প্রভৃতি শিশিরের প্রভাবেই পরিবর্তিত হয়, তাদের ক্ষেত্রে হয়েছে peaceful evolution; ভীষণ দুষ্টু ছেলে অজয়কে পরিবর্তিত করতে হলে দরকার violent revolution. পাত্র ভেদে ব্যবস্থার হেরফের হওয়া সংগত এবং স্বাভাবিক।

ভূমিকায় এত কথা অবতারণা করার অনিচ্ছাই ছিল, বিশেষতঃ কিশোরদের গ্রন্থে। তবে বহুদিক হতে যে-সব অভিযোগ উঠেছে তার সম্বন্ধে কিছুটা বলার সুযোগ না নিয়ে পারলাম না।

মনোরঞ্জন ঘোষ

বোশেখ মাসের দুপুর, চারদিক নিঝুম।

মিত্তিরদের আমবাগানের উড়ে মালী জনার্দনের কেমন যেন মনে হয় বাগানের এক কোণ হতে চাপা গোলমালের আওয়াজ আসছে। হাতের লাঠিটা ভাল করে বাগিয়ে ধরে সে পা টিপে হাঁটা শুরু করে। কাঁচা আমের উপর পাড়ার ছেলেদের লোভ তার অজানা নয়।

হঠাৎ এক তীক্ষ্ণ শিস দেওয়ার শব্দে মালী বোঝে নিশ্চয় এ কোন ছেলের বদমাইশি ; মুখে আঙুল পুরে শিস দিয়ে তার দূরের সঙ্গীদের সতর্ক করে দেয়। জনার্দন ছেলেদের ধরার জন্য দৌড়ান শুরু করে।

একটা কাঁচা-মিঠে আম গাছের উপর ছেলেদের আক্রমণ চলেছে। গাছে উঠেছে পাঁচ-ছজন, নীচেও কয়েকজন আছে। উপরের ছেলেরা নিজেদের পকেট ও কোঁচড় ভর্তি করার পর ডাল ঝাঁকি দিয়ে আম-বৃষ্টি শুরু করেছে, আর নীচের ছেলের দল সানন্দে তাই কাড়াকাড়ি করে কুড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে শিসের শব্দ কানে আসে।

মুহূর্তের মধ্যে গোলমাল থেমে যায়। নীচের ছেলেদের মধ্যে একজন বলে, সব তাড়াতাড়ি নেমে আয়! ঘণ্টু তিনবার শিস দিয়েছে।

নীচু ডাল হতে দু-তিন জন লাফিয়ে নামে। দলের সর্দার অজয়ও তাড়াতাড়ি নামা শুরু করে দেয় এবং মগডালে ওঠা একটি ছেলেকে ডাকে, বিজু, তাড়াতাড়ি!

—যাচ্ছি! উপর হতে বিজু বলে।

—অতো উঁচুতে উঠতে ঐজন্য বারণ করেছিলাম।

দূরে মালীকে দেখা যায়। পচা চেঁচিয়ে ওঠে, মালী আসছে। পালা! পালা!

ছেলেরা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালায়। ছেলেদের দেখতে পেয়ে মালী এই গাছের দিকেই দৌড়ে আসে। গাছের উপর হতে বিজু সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে সকরুণ মিনতি জানায়, আমায় ফেলে যাসনি ভাই।

কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে সকলেই পালায়, শুধু অজয় ছাড়া। দলের নেতা অজয় সঙ্গীকে ফেলে যেতে পারে না। এক ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে। মালী গাছতলায় এসে দাঁড়াতেই গাছের উপর বিজুকে দেখতে পায়। চোখ পাকিয়ে লাঠি তুলে সে গর্জায়, রুজ রুজ আম চুরি করি পাড়িছ, আজ তোতে মিলল। আজ মু তোতে খাই পকিমি।

নিরুপায় বিজু মালীর করুণা উদ্রেকের চেষ্টা করে, আজ ছেড়ে দাও মালী। আর কোনদিন আসবো না।

মালী বিজুর উদ্দেশ্যে লাঠির এক খোঁচা মেরে বলে না, না, আজ মু তোতে কেত্তে বেড়ে ছাড়িবি নাই। এ তোর কাম আছি। মু কেত্তে দিন ধরি পাই নাই। আজ সড়া মু তোতে ধরুচি। সড়া, চঞ্চড় চলি আস, উড়ি আস।

ঝোপের আড়াল হতে অজয় দেখে বিজুর অসহায় অবস্থা। সে একটি আম নিয়ে পিছন হতে সজোরে মালীর মাথায় ছুড়ে মারে। মালী আর্তনাদ করে মাথায় হাত দিয়ে পিছন ফিরে অজয়কে দেখিতে পায়।

—আউ গুটে সড়া সেইটি আছ। রইথ মু তোতে দেখিমি। মালী অজয়কে তাড়া করে।

অজয় 'চোর-চোর খেলা' শুরু করে, ঝোপের চারদিকে ঘুরপাক খাওয়ায় মালীকে। চেঁচায়, বিজু, পালা! পালা!

বিজু এই সুযোগে গাছ হতে লাফ মেরে নেমে পালায়। অজয় আরও কয়েকটা আম মালীর উদ্দেশ্যে ছুড়ে বিজুকে অনুসরণ করে।

মালী তারস্বরে চীৎকার শুরু করে, এই অর্জুন ভাই! চঞ্চড় চলি আস, সড়া মুকে মারি কি পালি যাউছি। এ অর্জুন ভাই—এয়ে মাগুনে ভাই!

মালীর চীৎকারে লোকজন ছুটে আসে। কয়েকজন মালীর সঙ্গে সঙ্গে অজয় ও বিজুকে তাড়া করে।

অজয় ঘুরে দাঁড়িয়ে টিপ করে মালীর নাকে একটি আম ছুড়ে মারে। ইয়ে বাপ্পগ! বলে নাকে হাত দিয়ে মালী মাটিতে

বসে পড়ে। নাক দিয়ে দর দর ধারে রক্ত বেরোয়। মালীকে কয়েকজন ঘিরে ধরে; সোৎসাহে যারা অজয়কে তাড়া করছিল তারাও থেমে যায় অজয়ের ঐ কাঁচা আমের স্বাদের ভয়ে। অজয় ও বিজু নির্বিঘ্নে পালায়।

জেলা বোর্ডের রাস্তার ধারে এক গাছতলায় দলের অন্যান্য ছেলেরা অজয় ও বিজুর জন্য অপেক্ষা করে। একটু বাদেই দুজনে এসে দলে যোগ দেয়।

পচা জিজ্ঞাসা করে, তোদের ধরতে পারেনি তাহলে?

অজয় সগর্বে বলে, দূর! ও ব্যাটা কি ধরবে? মেরে ব্যাটার নাক থ্যাবড়া করে দিয়েছি।

বিজু বলে, তোরা তো দিব্যি পালিয়ে এলি। ওদিকে মালীর চীৎকারেও লোক জুটে গিয়েছিল। তাদের সঙ্গে মারামারি করে আমাদের পালিয়ে আসতে হলো।

অজয় পলাতক বন্ধুদের বলে, দে, কয়েকটা আম আমাদের দুজনকে দে। যত আম ছিল সব মালী ব্যাটার টাকে আর ভুঁড়িতে মেরেছি।

সকলে হো হো করে হেসে ওঠে। মালী জব্দ হয়েছে শুনে খুব খুশী হয়।

হাট থেকে মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে ফিরছিল পরান মণ্ডল। দূর থেকেই তার গরুর গাড়ি ছেলেদের নজরে পড়ে। পথের ধারে পুকুর পড়ায় তৃষ্ণার্ত মোড়ল গাড়ি থামিয়ে

জলে নামে। যা কাটফাটা রোদ্দুরে এতখানি পথ আসতে হয়েছে তাতে চোখে-মুখে একটু ঠাণ্ডা জল লাগাবার লোভ মোড়ল সামলাতে পারে না। হাত-পা-মুখ বেশ করে জলে ধুয়ে অগস্ত্য মুনির সমুদ্র শোষণ করার মত সে চোঁ চোঁ করে জলপান শুরু করে। কিন্তু তার গণ্ডুষ করা হাতের জল আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে, জলপান বন্ধ করে মুখ তুলে তাকে অবাক হতে হয়; কানে আসে 'হেট্ টি টি' চীৎকার···

ছেলেরা গরুর গাড়ি চালাবার চেষ্টা করছে। হৈ হৈ করে সকলে গাড়ির উপর চেপেছে। দুজনে তালুতে জিভে ঠেকিয়ে 'টক্ টক্' আওয়াজ করে গরুর লেজ মুলছে। মনের আনন্দে ছেলেরা গান ধরেছে—

"ট্যারছা বাঁকা রথের চাকার নাইরে তুলনা,
বলদ জোড়া নয় রে বলদ, পঙ্খী-রাজের ছা।"

এই এই ছোঁড়ারা, বলে চেঁচাতে চেঁচাতে পরান মণ্ডল জল থেকে উঠে আসে। পরানের চীৎকার ও ছেলেদের হৈ চৈ শুনে গরুগুলো ভড়কে গিয়ে প্রাণপণে দৌড়ান শুরু করে দেয়। ছেলেরা গাড়ি সামলাতে পারে না। সশব্দে গাড়ি পুকুরের ঢালু পাড় বেয়ে জলের দিকে চলে। ছেলেরা টপাটপ গাড়ি হতে লাফ মারে। গাড়ি গিয়ে জলে পড়ে। পরান মণ্ডল দৌড়ে আসার আগেই ছেলেরা দৌড়ে সরে পড়ে। পিছন হতে শুধু তার চীৎকার শোনা যায়।

দৌড়তে দৌড়তে ছেলেরা হাজির হয় খেয়াঘাটে। নপাড়ার সঙ্গে আজ ফুটবল ম্যাচ আছে। দল বেঁধে পাড়া থেকে সেই উদ্দেশ্যেই বের হয়েছে সব। ঘূর্ণি হাওয়ার মত চলার পথে চিহ্ন রেখে চলেছে।

খেয়াপারের জন্য অনেকেই অপেক্ষা করছে; তাদের মধ্যে হাটুরে লোকও আছে। তরি-তরকারি ইত্যাদির বোঝা নিয়ে অপেক্ষা করছে দূর গাঁয়ের হাটে যাবার জন্যে। একজনের পাকা কলার কাঁদি অজয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অজয় চুপি চুপি পচার কানে কিছু বলে। পচা দৌড়ে চলে যায় কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে খানিকটা দড়ি যোগাড় করার জন্য।

খেয়া ঘাটে এসে লাগে। যাত্রীরা কলরব করে ওঠে, চলো হে চলো।

একদল নামে, একদল ওঠে।

পচা ফিরে এসে চুপি চুপি কয়েক হাত দড়ি অজয়ের হাতে দেয়। মাঠ থেকে কোন গরুর গলা হতে খুলে এনেছে। অজয় দড়িটা লুকিয়ে জামার তলায় নিয়ে নৌকায় উঠে কলাওয়ালার পাশে গিয়ে বসে। ছেলেরা নদীতে নেমে হাত-মুখ ধোওয়া শুরু করে।

মাঝি চীৎকার করে, আর কে যাবেগো? এইসো—

কলাওয়ালা নিশ্চিন্তে বিড়ি ধরিয়ে বলে, আর কেউ নেই। তুমি খেয়া ছাড় গো।

ইতিমধ্যে সবার অলক্ষ্যে অজয় কলার কাঁদিতে দড়ির এক গিট বেঁধে দিয়ে দড়ির অপর প্রান্ত জলে ফেলে দেয়। পচা জলের মধ্যে দড়িটা ধরে নিয়ে বলে, নেমে আয়, অজয়! পরের খেয়ায় যাবি, এটাতে বড্ড ভিড়।

অজয় নৌকা হতে নেমে পড়ে। নৌকা ছেড়ে দেয়। নৌকা যখন খানিকটা দূর গেছে তখন ছেলেরা দড়িতে টান মারে। নৌকার পাটাতনের উপর রাখা কলার কাঁদি সেই টানে ঝপাং করে জলে পড়ে। কলাওয়ালা বিস্ময়ে চীৎকার করে ওঠে। নৌকার অন্যান্য যাত্রীরা দেখে পাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য বস্তুর সঙ্গে ছেলেরা 'টাগ্-অব্-ওআর' করছে। ব্যাপারটা তাদের কাছে পরিষ্কার হবার আগেই ছেলেরা কলার কাঁদি জল থেকে তুলে কাঁধে নিয়ে দৌড়ে পালায়।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা অজয়ের অভিভাবক রমাপতিবাবুর বাড়িতে ধীরেশ মিত্তির তাঁর আহত মালীকে নিয়ে আসেন নালিশ জানাতে। সঙ্গে আসেন পাড়ার আর পাঁচজনও। রমাপতিবাবু গম্ভীরভাবে তাঁদের বক্তব্য শোনেন।

বৃদ্ধ ধীরেশবাবু বলেন, একবারে খুনে ডাকাত হয়েছে। নিত্যি নতুন উৎপাত। সেদিন মহেশ মোক্তারের ছেলেটাকে কী মারটাই মারলে। আজ আবার আমার বাগানে দলবল নিয়ে চুরি করতে আসে। আমার মালী জনার্দন ওদের তাড়া করায় মেরে ওর অবস্থাটা কি করেছে দেখেছেন একবার।

জনার্দন হাউ মাউ করে কাঁদে। বলে, মুতে মাইলা বাবু। এ দেখ নাক দিয়া নহু বার হউচি; মু আউ বাঁচিবি নাই। ইয়ে বাপ্পল!—

প্রতিবেশী পশুপতিবাবু বলেন, পালের গোদা হচ্ছে ও। পাড়ার সব ছেলের মাথা খাচ্ছে। আপনি যদি এর বিহিত না করেন—

মুখ হতে তামাকের নল নামিয়ে রমাপতিবাবু বলেন, আমি কথা দিচ্ছি এর উপযুক্ত ব্যবস্থা আমি করবো।

টিকে-তামাকের আগুন যেমন ফুঁ দিলে গন্‌গন্‌ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি এদের কথায় জ্যাঠামশাইয়ের রাগটা বেড়ে যায়।

এমন সময় বাইরে হতে কে যেন ডাকে, বড়বাবু! বড়বাবু!

কাঁদতে কাঁদতে কলাওয়ালা ভেতরে ঢোকে। হাত জোড় করে করুণ কণ্ঠে সে জানায়, বড়বাবু! আমার সব কলা দাদাবাবু কেড়ে নেছেন। বেচার জন্য হাটে নে যাচ্ছিনু! দাদাবাবু খেয়াঘাট থেকে সব নে গেছেন। গরীব নোক বাবু—

—তোমার কলার দাম কত?

—তা সাত সিকে হবে বাবু।

—হুঁ, এই নাও! রমাপতিবাবু পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু টাকা বের করে তার হাতে দেন। বলা বাহুল্য সাত সিকের বেশী।

কলাওয়ালা আশাতিরিক্ত অর্থ পেয়ে খুশী হয়ে প্রণাম করে চলে যায়।

ধীরেশবাবু বলেন, এই রকম কত লোককে আপনি খেসারত দেবেন? তার চেয়ে ভাইপোকে শাসন করুন। সেও মানুষ হবে, আর পাড়ার লোকও বাঁচবে। আচ্ছা, আজ আমরা আসি, মুখুজ্জে মশাই।

প্রতিবেশীরা চলে যায়। রমাপতিবাবু অজয় সম্বন্ধে রীতিমত চিন্তিত হয়ে ওঠেন। পাড়ার পাঁচজনের ধারণা পিতৃহারা ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি মোটেই শাসন করেন না। কিন্তু অজয়কে সত্যি তিনি খুবই শাসন করেন। ভাইপোকে আন্তরিক ভালবাসলেও আদর দিয়ে বাঁদর তৈরি করার পাত্র তিনি নন। অন্যায় করলে যথেষ্ট প্রহার করেন। ছেলেটা কিন্তু মার খেয়েও শোধরায় না। দিন দিন এমন একগুঁয়ে আর পাজী হয়ে উঠেছে। কতদিন তিনি বলে দিয়েছেন যে সন্ধ্যা

হলেই বাড়ি ফিরতে, অথচ আজ এতো রাত হল এখনও তার ফেরার নাম নেই।

আলমারির কোণ হতে বেতটা টেনে বের করে তিনি বারন্দায় পায়চারি শুরু করেন।

হুর্‌রে! হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রে!

গ্রামপথ কলরবে মুখরিত করে ছেলেরা বাড়ি ফেরে। নপাড়াকে তারা ফুটবল ম্যাচে চার গোলে হারিয়ে কাপ পেয়েছে। কাপ্টেন অজয়কে ছেলেরা কাঁধে তুলে নিয়ে আসছে। গলায় তার বেস্টম্যান মেডেল ঝুলছে।

থ্রি চিয়ার্স ফর অজয়! হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রে!

বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়ায় অজয় ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বলে, ছাড়! ছাড়! চুপ কর! জ্যাঠামশাই চেঁচামেচি শুনলে ভীষণ রাগ করবে।

—এতো বড় একটা কাপ জিতে আনলি তাতেও রাগ করবে?

—ও কাপ ডিশ জ্যাঠামশাই কিছু বোঝে না! তোরা বাড়ি যা!

ছেলেরা নীরবে চলে যায়। অজয় কাপ হাতে নিয়ে চুপি চুপি বাড়ি ঢোকে। পা টিপে টিপে পড়ার ঘরে ঢোকার আগেই কিন্তু সে জ্যাঠামশাইয়ের খপ্পরে পড়ে। বাঘের মত এসে তিনি অজয়ের ঘাড় ধরে গর্জে ওঠেন। কোথায় ছিলে এতো রাত অবধি? বলো কোথায় ছিলে?

অজয় কোন জবাব দেয় না। ফুটবলের ফাইন্যাল খেলে ফিরছে একথা জ্যাঠামশাইকে জানিয়ে কোন লাভ হবে না।

জ্যাঠামশাইয়ের নজর অজয়ের হাতের কাপের উপর পড়ে। কথায় জবাব না পাওয়ায় তিনি রেগে আগুন হন। অজয়ের পিঠে সপাং সপাং করে কয়েক ঘা বেত মেরে তিনি বলেন, কাপ পেয়েছেন। কাপ কাপ···টান মেরে কাপটা ছুড়ে ফেলে দেন। বেত্রাঘাত চলে····

—তোমার জন্য লোকের কাছে মুখ দেখাবার উপায় নেই। নালিশ শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। পড়াশোনার নাম নেই, দিনরাত খালি হৈ হৈ···স্টুপিড···বাঁদর কোথাকার···

চুলের ঝুঁটি ধরে হিড় হিড় করে তিনি অজয়কে পড়ার ঘরে টেনে নিয়ে আসেন। বলেন, রাত দশটার আগে যদি বইয়ের পাতা বন্ধ করতে দেখি, তবে তোমার একদিন কি আমারই একদিন।

তারপর আপন মনে গজরাতে গজরাতে নিজের ঘরে ঢোকার আগে বারান্দা হতে রান্নাঘরে অজয়ের মার উদ্দেশ্যে বলেন, বৌমা, আজ ওর খাওয়া বন্ধ। ওর শাস্তির দরকার। পাড়ার লোকেরা দল বেঁধে নালিশ করে, আমার আশকারা পেয়েই নাকি ও উচ্ছন্নে গেল।

নিজের ঘরে ঢুকে স্বগতোক্তি করেন, আমায় এসেছে সব শাসন শেখাতে···শাসন যেন আমি করি না····শাসন····শাসন···

গড়গড়ার নলটা তুলে নিয়ে সজোরে ঘন ঘন কয়েকটি টান মারার পর বোঝেন কলকের আগুন ইতিমধ্যে নিভে গেছে। নলটি নামিয়ে রেখে চিন্তা করেন। পাড়ার পাঁচজন এসে মেজাজটা এমন গরম করে দিয়ে গেছে। যত দোষ যেন একা তাঁর ভাইপোরই, আর সকলের ছেলে যেন একেবারে শান্ত সুবোধ বালক। আরে, তারাই তো অজয়ের যত দুষ্টুমির সঙ্গী। নিজের ছেলের দোষ কেউ দেখতে পায় না। লোকের কথা শুনে ছেলেটাকে বড় বেশী মারা হয়েছে। মনের মধ্যে একটা অনুতাপ ধীরে ধীরে জেগে ওঠে। ক্ষণপূর্বের রুদ্ররূপী মানুষ স্নেহ ও করুণায় আর্দ্র হয়ে ওঠেন।

হঠাৎ কাপটির কথা মনে পড়ে। ধীরে ধীরে গড়গড়ার নলটি নামিয়ে রেখে বারান্দায় নিঃশব্দে বেরিয়ে আসেন। কাপটি কুড়িয়ে নেন। ছুড়ে ফেলে দেওয়ার জন্য একধারে একটু টোল খেয়েছে, ধুলোও লেগেছে। কোঁচার খুঁট দিয়ে মুছে কাপটিকে পরিষ্কার করেন, দুহাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন।

পাশের ঘর হতে পাঠনিরত অজয়ের কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

অজয় কিন্তু মন দিয়ে মোটেই পড়ছে না। মার খেয়ে মনটা তার বিগড়ে গিয়েছে। জ্যাঠামশাইয়ের উপর একটা অক্ষম নিষ্ফল আক্রোশে সে ভিতরে ভিতরে ফুলে ওঠে। মারের শোধ নেবার একটা ইচ্ছে তার মনে জাগে। জ্যাঠামশাইকে জব্দ করার একটা বুদ্ধি বের করতে হবে। সংস্কৃত শ্লোক সে আওড়ায় পাঠ্য পুস্তক হতে—

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য, নির্বুদ্ধেস্তু কুতো বলম্ ?
পশ্য সিংহো মদোন্মত্তঃ শশকেন নিপাতিতঃ।

নিপাতিতঃ ··শশকেন নিপাতিতঃ···বলতে বলতে অজ্ঞাতসারেই সে কম্পাসের ছুঁচলো দিক দিয়ে টেবিল সজোরে আঘাত করে চলে। তার থেকে অনেক বড় জ্যাঠামশাইকে মনে মনে নিপাত করার এক ক্রূর আনন্দ উপভোগ করে।

ঘড়ির দিকে অজয়ের দৃষ্টি পড়ে। সবে নটা বেজে পাঁচ মিনিট, দশটা বাজতে এখনো অনেক দেরি। অথচ ভীষণ খিদে পেয়েছে, সেই দুপুরে দুটি ভাত খেয়ে বেরিয়েছে তারপর সারা দিন হৈ হৈ করে কেটেছে, তার উপর ফুটবল খেলার ক্লান্তি।

হঠাৎ এক বুদ্ধি মাথায় আসে। তাড়াতাড়ি চেয়ারটা ঘড়ির কাছে টেনে নিয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দশটার কাছে নিয়ে যায় অজয়। মিনিট কয়েক বাদে ঢং ঢং করে ঘড়িটায় দশটা বাজতেই অজয় বই বন্ধ করে লাফিয়ে উঠে পড়ে।

রান্নাঘরের দাওয়ায় এসে সে বলে, মা, শীগগির ভাত দাও। দশটা বেজে গেছে। মা কোন জবাব দেন না।

দেয়ালের কোণ হতে পিঁড়ি টেনে নিয়ে জাঁকিয়ে বসে অজয় জিজ্ঞাসা করে, রান্না এখনো শেষ হয় নি ?

মা একথারও কোন জবাব দেন না।

অজয় আপন মনেই বলে চলে, বড্ড খিদে পেয়েছে, মা। আজ, একাই চারটে গোল দিয়েছি। কী রকম কাপ পেয়েছি

তোমায় দেখাবো'খন। ও, তুমি রাগ করেছো? থাক্ গে, ভাতটা আগে দাও। ভীষণ খিদে পেয়েছে।

মা বলেন, আজ তোমার খাওয়া বন্ধ।

একটু অবাক হয়ে অজয় বলে, কেন? আমার তো পেটের অসুখ করে নি।

—জ্যাঠামশাই বারণ করেছেন তোমায় খেতে দিতে।

—ও!

অজয় গম্ভীরভাবে পিঁড়ি হতে উঠে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

জ্যাঠামশাই খেতে বসেন। অজয়ের ঘরের দিকে একবার চেয়ে প্রশ্ন করেন, অজু বুঝি আগেই খেয়ে নিয়েছে?

—না।

—তবে?

—আপনি বারণ করেছেন।

ও! রাগের মাথায় তখন রমাপতিবাবু যা বলেছিলেন এখন সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন। সত্যি করে তিনি চান নি ছেলেটা সারা রাত্রি অভুক্ত থাকে। তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পাতের ভাতগুলি নাড়াচাড়া করেন।

—আপনি যে মোটেই খাচ্ছেন না।

মোটে খিদে নেই আজ, বলে তিনি উঠে পড়েন।

অজয়ের মা যখন জ্যাঠামশাইকে পান দিতে আসেন, তখন

তিনি বলেন, বৌমা, তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে। হ্যাঁ, তোমার খাওয়া হয়ে গেছে ?

গড়গড়ার নলটা নামিয়ে একটু মৃদু হেসে জ্যাঠামশাই বলেন, লুকোচুরি এখনো ভাল করে শিখতে পারলে না, বৌমা আমাকে জানিয়ে লুকিয়েই ভাত দিতে। তাতে আমি মনে মনে খুশীই হতাম, আর তাহলে কারুকে সারা রাত উপোস করতে হতো না। যাক্, তোমায় যা বলবো ভেবেছি শোনো—অজুর দেখছি এখানে থাকলে পড়াশোনা একেবারে হবে না। দিনরাত্তির সাথীসঙ্গী নিয়ে হৈ হৈ করে বেড়ায়। তাই একটা ভাল বোর্ডিংয়ে রেখে ওর পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে থেকে জীবনটা গড়ে ওঠে, মানুষের মত মানুষ হয়। এ সম্বন্ধে তোমার মত কি ?

—আপনি যা ভাল বোঝেন—

—না, না, কথা তা নয়। কথা হচ্ছে ওকে কাছছাড়া করতে তোমার কষ্ট হবে না তো ?

—ওর ভালর জন্যে সব কষ্ট সহ্য করতে হবে।

—ঠিক কথা। ওর ভালর জন্য সব কষ্ট সহ্য করতেই হবে। তবু মায়ের প্রাণ অনেক সময় স্নেহে অন্ধ হয়ে প্রবোধ মানে না। যাক্, তোমার কথায় আমি খুব খুশী হয়েছি। তুমিই তাহলে ওকে বুঝিয়ে বলো সামনের মাসেই ওকে শহরের স্কুলে ভর্তি করে দেবো। যে একগুঁয়ে ছেলে, শুনেই হয়তো বেঁকে বসবে।

তার ওপর আমার মুখ থেকে শুনলে তো ক্ষেপেই উঠবে। কি জানি কেন আমাকে ও বিশেষ সুনজরে দেখে না।

মৃতদার অপুত্রক এই জ্যাঠামশাইকে সত্যি অজয় ভুল বোঝে। বাইরে তাঁর রুক্ষ ব্যবহার ও শাসনের জন্য অজয়ের মন তাঁর উপর বিরূপ। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত স্নেহধারার সন্ধান সে পায় না।

শহরের বোর্ডিং-স্কুলে যাবো না। অজয় দৃঢ়কণ্ঠে আপত্তি জানায় মার প্রস্তাবে।

মা বলেন, তোমার জ্যাঠামশাই সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন, না গেলে উনি দুঃখ পাবেন।

—আমার ভারী বয়ে গেল। ব্যঙ্গস্বরে অজয় বলে, দুঃখ পাবেন! জ্যাঠামশাইয়ের বদমাইশী বুদ্ধি তো কম নয়।

—ছিঃ অজয়!

—সহজ কথায় আমায় উনি এখান থেকে তাড়াতে চান।

—উনি তোমায় কত ভালবাসেন তা তুমি জানো না।

—খুব জানি। সব সময় চোখ রাঙিয়েই আছেন।

—তুমি যাতে ভাল হও সেইজন্যেই উনি শাসন করেন।

—শাসন একদিন বের করে দেবো। গায়ে হাত তুলতে আসুক না একদিন, এবার ল্যাং মেরে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবো। আমার কাঁইচি মারের সামনে মাঠে দাঁড়াতে পারে না কেউ।

—অজয়!

—কি?

—তুই আমায় ভালবাসিস না ?

—নিশ্চয়ই বাসি।

—আমার দুঃখ তুই দূর করতে চাস না ?

—চাই বৈ কি।

—লেখাপড়া শিখে তোর মানুষ হতে ইচ্ছে করে না ?

—মানুষ হতে খুব ইচ্ছে করে, কিন্তু লেখাপড়া করতে মোটে ইচ্ছে করে না।

—কেন ?

—ও সব আমার ভাল লাগে না।

—ভাল না লাগলেও তো চেষ্টা করা উচিত !

—চেষ্টা করে দেখেছি, মা। ও আমি পারি না।

—তোকে পারতেই হবে। জানিস তো নেপোলিয়নের গল্প, 'অসম্ভব' কথা শুধু বোকারাই ব্যবহার করে।

—ও গল্প আমি জানি, মা। নেপোলিয়নের মত পাহাড়ও আমি ডিঙোতে পারবো। কিন্তু লেখাপড়াটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস এ তুমি বুঝছো না কেন মা ? পাহাড় ডিঙোনো, নদী সাঁতরানো, বোমা-বন্দুক নিয়ে লড়াই এ হচ্ছে এক জিনিস আর—

—আমার কথা শোন্। একগুঁয়ের মত তর্ক করিস নি ! মন দিয়ে চেষ্টা করলে সব কিছুই করা চলে এ কথা জানিস তো ?

—তা জানি।

—তবে ?

—কিন্তু তোমায় ছেড়ে অত দূরে আমি থাকতে পারবো না।

—অবুঝ হস নি। চিরকাল কি মায়ের কোলের মধ্যে থাকবি ? কই দূর গ্রামে যখন দল বেঁধে খেলতে যাস তখন তো আমায় ছেড়ে যেতে অমন করিস না ? আর পড়তে যাবার বেলায়ই যতো মন খারাপ !

—খেলতে যাওয়া আর এ এক কথা ?

—এক না হলেও খুব তফাত নেই। খেলতে গিয়ে অনেক সময় দু-একদিন পরে ফিরে আসিস, এ না হয় দু'তিন মাস বাদে আসবি। সাথীসঙ্গীর অভাব সেখানেও হবে না। শেষে হয়তো মার কথা আর মনেও পড়বে না !

মার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে অজয় বলে, তাই নাকি কখনো হয় ?

মা আদর করে অজয়ের মাথা বুকে টেনে নিয়ে বলেন, হয় রে হয়। শেষে দেখিস'খন, যাক্ আর আপত্তি করিস না। যাবার দিন দেখতে বলি জ্যাঠামশাইকে, কেমন ?

৩

আপত্তি অবশ্য অজয়ের একান্তই ছিল। সেদিন বিকালে যখন ছাতে উঠে অজয় ঘুড়ি উড়াচ্ছিল তখন মা এসে জানালেন, নতুন স্যুটকেস কেনা হয়েছে, জামা-কাপড় সব গুছিয়ে তাতে তুলে রাখছি। তুমি দেখবে এসো।

কথাটা শুনেই অজয়ের ভীষণ রাগ হয়ে গেল। মনটা তার একটু আগে থেকেই খারাপ হয়ে আছে। একটা ভাল ময়ুরপঙ্খী

ঘুড়ি সামনের নারিকেল গাছে আটকায় এবং টানাটানি করতে গিয়ে প্রায় হাতের গোড়া হতে অনেকখানি সুতো উপড়ে যায়।

সে হাতের লাটাই ছুড়ে ফেলে দিয়ে দুম্ দুম্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে চীৎকার করতে করতে—না, না, শহরের বোর্ডিংয়ে কিছুতেই যাবো না।

মা মিনতি জানান, অজয়, শোন!

না, না, আমি শুনবো না। এখান থেকে একটা পাও নড়বো না। গম্ভীর ভাবে অজয় বলে।

ব্যথিত কণ্ঠে মা বলেন, তুই আমার কথা রাখবি নি?

অজয় গর্জে ওঠে, না, না, না। আমি কোন কথা রাখবো না।

মার কণ্ঠ কান্নায় বুঁজে আসে। চোখের জল চেপে তিনি বলেন, বেশ, তোর যা খুশি তাই কর্। আমি আর তোকে কিছু বলবো না। আমি জানবো আমার দুঃখ দূর করার কেউ নেই।

মা ঘর ছেড়ে চলে যান। মার এই করুণা-উদ্রেকের চেষ্টায় অজয়ের রাগ আরও বেড়ে যায়। সে আপন মনে বলে, বলবে না? কিছু বলবে না তো বয়েই গেল। ভয় দেখিয়ে বোর্ডিংয়ে নিয়ে যাবে? হঠাৎ তার নজর পড়ে নতুন স্যুটকেসটার উপর, রাগটা আরও বেড়ে যায়। ও! যাবার জন্য নতুন স্যুটকেস এসেছে। দেবো ভেঙে!

সত্যি সে এক টান মেরে স্যুটকেসটা ছুড়ে ফেলে দেয়, কাচানো জামা-কাপড়গুলি ছুড়ে ঘরময় ছড়ায়। চেয়ারটায় এক

লাথি মেরে উল্টে দেয়। হাতের কাছে যা পায় তাই মেঝেয় আছড়ে মারে, ঘরের মধ্যে শুরু করে প্রলয় তাণ্ডব। সমস্ত তছনছ করে শেষে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। মনে মনে আশা করেছিল ইতিমধ্যে মা নিশ্চয় ছুটে আসবে এবং বোর্ডিংয়ে যাওয়া স্থগিত করা সম্বন্ধে আশ্বাস দেবে। কিন্তু মা না আসায় অজয় একটু মুষড়ে পড়ে, ঘটনার পরিণতি তার আশানুযায়ী হলো না।

আস্তে আস্তে ঘর হতে সে বের হয় মা কোথায় কি করছেন দেখার জন্যে। একটু অবাক হয় মাকে দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে নীরবে চোখের জল ফেলতে দেখে। অজয় মায়ের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। খুব আস্তে ডাকে, মা!

কোন সাড়া পায় না। চুপি চুপি এক খড়ি দিয়ে সে দরজার উপর কি লেখে। তারপর সশব্দে দরজা বন্ধ করে মার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। দরজার উপর মার চোখ পড়ে,— খড়িতে লেখা রয়েছে, 'অজয় যাইবে'।

যাবার দিন খেলার সাথীরা ভিড় করে এসে দাঁড়ায় দরজায়। গোপনে অজয়ের হাতে গুঁজে দেয় বাগান থেকে পেড়ে আনা পেয়ারা। বন্ধুকে বিদায় দেবার ভাষা খুঁজে পায় না তারা, শুধু চোখ জলে ভরে ওঠে।

তাদের সান্ত্বনা দিয়ে অজয় বলে, কাঁদছিস কেন রে? আমি তো শীগ্গিরই ফিরে আসবো।

পচা জিজ্ঞাসা করে, কবে তুই আসবি অজয়?

শীগ্‌গিরই আসবো। এর বেশী অজয় বলতে পারে না, তার গলাও কান্নায় বুঁজে আসে। বাল্যবন্ধুদের ছেড়ে যেতে তার মন কেমন করে। মনে পড়ে মিত্তিরদের আমবাগানে স্কুল পালিয়ে আমচুরির কথা, মনে পড়ে নপাড়ার সঙ্গে ফুটবল ম্যাচের কথা···আরও কত কথা····

পচাকে সে বলে, দেখিস পচা সামনের ফাইন্যালে আমাদের টীম যেন হেরে না যায়।

ওদিক হতে জ্যাঠামশাই তাড়া দেন, এসো অজয়। ট্রেনের সময় হয়ে যাচ্ছে।

সঙ্গীদের ছেড়ে অজয় এগিয়ে গিয়ে গরুর গাড়িতে চাপে। হঠাৎ মনে পড়ে তার সাধের ঘুড়ি-লাটাই বিজুকে দিয়ে এলে হতো। ঘুড়ি ওড়াবার সুযোগ হয়তো আর পাওয়া যাবে না।

গ্রামের পথ দিয়ে গরুর গাড়ি এগিয়ে চলে। বাঁকের মুখে দেখা যায় সজল চোখে সঙ্গীরা দাঁড়িয়ে। অজয়ের চোখেও জল আসে।

জ্যাঠামশাই বলেন, মিছিমিছি মন খারাপ ক'রো না।

তাঁর কথা অজয়ের কানে আসে না। মন তার রয়েছে তখন পিছনে পড়ে।

স্কুল হোস্টেল। বড় রাস্তার উপরে দ্বিতল বাড়ি। সামনে খানিকটা পরিষ্কার জমি, ছেলেরা বিকেলে বল খেলে। এক-পাশে একটি ছোট পুকুর আছে, গ্রীষ্মকালে সবাই সাঁতার কাটে সেখানে।

বাড়ির এক একটি ছোট ঘরে চারজন করে ছাত্র থাকে। ঘরগুলির সামনে বেশ প্রশস্ত বারান্দা, সকাল-সন্ধ্যায় ছেলেরা সেখানে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা-সংগীত করে। একতলায় সিঁড়ির ধারের ঘরেই থাকেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নন্দদুলালবাবু। ছেলেরা তাঁকে যমের মত ভয় করে। চেহারা তাঁর যমদূতেরই মত, যেমন কালো তেমনি মোটা। গোল ভাঁটার মত চোখ দুটি পাকিয়ে বজ্রগম্ভীরস্বরে তিনি যখন ধমক দেন তখন ছেলেদের পেটের পিলে চমকে ওঠে। নন্দবাবুকে জীবনে বোধ হয় ছেলেরা কখনো হাসতে দেখে নি, সেইজন্য তারা তাঁর নামকরণ করেছে 'রামগরুড়'। আড়ালে সকলে ছড়া কাটে। 'রামগরুড়ের ছানা, হাসতে তাদের মানা!'

জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে অজয় যখন হোস্টেলে ঢোকে ঠিক সেই সময়েই নীচের তলার ঘর হতে অমূল্য পেন্সিল কাটার জন্য ছুরি হাতে বারান্দায় বের হয়। সে দূর থেকে দেখে চাকর রামের মাথায় বিছানাপত্র চাপিয়ে একটি নতুন ছেলে গুটি গুটি আসছে চারদিকে অবাক চোখে চাইতে চাইতে।

অমূল্য দৌড়ে গিয়ে নিজের ঘরে ঢোকে। রুমমেট গোবিন্দ গুন গুন করে ইতিহাস মুখস্থ করছিল, পড়া থামিয়ে সে প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার রে?

পেন্সিল আর ছুরিটা পড়ার টেবিলে ছুড়ে ফেলে জানালার কাছে যেতে যেতে অমূল্য বলে, আমাদের গোয়ালে নতুন এক গরু এলো।

জানালার ধারে ঝোলান রয়েছে দেশলাইয়ের বাক্সের 'টেলিফোন', উপরের ঘরের সঙ্গে গোপনে কথা বলার সংযোগ সূত্র। অমূল্য গিয়ে সুতোয় টান মারে। উপরের ঘরের জানালার কাছে আছে খালি চায়ের টিনের বাক্সকে ঘণ্টার মত বাজবার ব্যবস্থা করা। ঘটাং ঘটাং শব্দে টিনের বাক্স বেজে ওঠে!

উপরের ঘরে তখন ছেলেদের জোর 'লুডো' খেলা চলেছে! বিছানার উপর লুডোর ছককে ঘিরে তাদের আসর বসেছে। পাশের ঘর হতেও দু-তিনজন এসে জুটেছে। এক কোণের বিছানায় বসে রূপ বলে একটি ছেলে তন্ময় হয়ে এক অ্যাডভেঞ্চারের গল্প পড়ছে। ছেলেরা বেশ নিশ্চিন্তেই খেলছে, কারণ বিরাট ভুঁড়ির ভার নিয়ে রামগরুড় সচরাচরে সিঁড়ি ভেঙে উপরে ওঠে না।

ঘণ্টার শব্দে খেলা বন্ধ করে রবি লাফিয়ে ওঠে। সঙ্গীদের বলে, টেলিফোন লাইন চাইছে। তাড়াতাড়ি জানালার কাছে গিয়ে দেশলাইয়ের খোল টেনে নেয়, বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি রবি···হ্যালো···হ্যালো···

নীচে হতে টেলিফোন মারফত অমূল্য জানায়, নতুন একজন এলো, দেখে গেঁয়ো মনে হয়।

সাগ্রহে রবি জিজ্ঞাসা করে, কোথায়? কোথায়?

নিশ্চয়ই তোদের উপরে শক্তিদের ঘরের খালি সীটে যাবে। অভ্যর্থনা কর্।

—ঠিক আছে। টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে রবি লাফিয়ে সঙ্গীদের কাছে ফিরে আসে। রেডি, রেডি, একজন আসছে, welcome করতে হবে।

ছেলেরা সোৎসাহে লাফিয়ে ওঠে। রূপ বইটা ছুড়ে ফেলে বিছানার বালিশটায় এক লাথি মেরে লাফিয়ে মেঝেয় পড়ে, ঘরের কোণ হতে হকি স্টিক হাতে তুলে নেয়।

অজয়ের থাকা সম্বন্ধে নন্দবাবুর সঙ্গে রমাপতিবাবুর কথাবার্তা সব শেষ হয়। নন্দবাবু রামকে বলেন, বিছানা-পত্রগুলো দোতলায় দু'নম্বর ঘরে নিয়ে যা। তুমি ওর সঙ্গে যাও, অজয়।

অজয় রামকে অনুসরণ করে। রমাপতিবাবু নন্দবাবুকে অনুরোধ করেন, আপনি একটু ওর উপর বিশেষ নজর রাখবেন।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। সে আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আর দেখুন, প্রত্যেক গার্জেনকেই আমি বলি টাকাকড়ি ছেলেদের হাতে বিশেষ দেবেন না। ছোট ছেলে টাকা পেলে আজে বাজে খরচ করে, তার চেয়ে আমার কাছে জমা দিয়ে যাবেন। আমি প্রয়োজন মত ওকে দেবো।

রমাপতিবাবু বলেন, বেশ !

রামের পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে অজয় উপরে ওঠে। ছেলেদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়—এই এসে গেছে। দরজার আড়ালে একটু লুকিয়ে দাঁড়ায় সকলে। অজয় যেই দরজার সামনে দিয়ে পেরিয়ে যায় অমনি পিছন হতে চুপি চুপি তার পায়ে হকি স্টিক বাধিয়ে রূপ টান মারে। অজয় টাল সামলাতে না পেরে রামের উপর পড়ে। সে সেই ধাক্কায় মুখ থুবড়ে পড়ে, মাথার বোডং বারান্দার রেলিংয়ের উপর দিয়ে নীচে পড়ে যায়। রাম চীৎকার করে ওঠে, ওরে বাবারে !

হকি স্টিক লুকিয়ে ফেলে ঘর থেকে ছেলেরা চীৎকার করে ছুটে আসে। অ্যাক্সিডেণ্ট ! অ্যাক্সিডেণ্ট···জল···জল···

রবি টপ করে এক কুঁজো জল এনে হুড় হুড় করে অজয়ের মাথায় ঢেলে দেয়। অজয় উঠে দাঁড়িয়ে সজোরে রবির মুখে এক ঘুষি মারে। রবি ছিটকে পড়ে। তার হাত হতে কুঁজো পড়ে ভেঙে চুরমার হয়। ছাত্রাবাসের ছেলেদের দুষ্টুমির নেতা রবি, কাজেই ছেলেরা সমস্বরে তাকে উৎসাহিত করে, রবি, লাগা—লাগা— ! রবি ওঠে। রীতিমত লড়াই শুরু হয়।

গ্রামের ছেলে অজয় শারীরিক শক্তিতে এদের কারুর থেকে কম নয়, সে তার প্রমাণ দেয় কয়েকটি ঘুষিতেই রবির মুখ দিয়ে রক্ত বের করে দিয়ে।

ছেলেরা মারামারির উত্তেজনায় প্রাণ খুলে চীৎকার

করছিল। সে চীৎকার নীচে নন্দবাবুর কানে যায়। তিনি উপরে ওঠেন, রমাপতিবাবুও তার সঙ্গে আসেন।

—এত গোলমাল কিসের? কি হয়েছে? অ্যাঁ—

নন্দবাবুর কণ্ঠস্বর কানে যেতেই ছেলেরা মুহূর্তের মধ্যে মারামারি থামিয়ে শান্তশিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। রবির ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে দেখে নন্দবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করেন, কে মেরেছে?

রবি আস্তে আস্তে বলে, কেউ মারেনি, স্যার। তাড়াতাড়ি দৌড়ে আসতে গিয়ে দরজায় ধাক্কা লেগেছে।

রবির কথা শুনে অজয় তার দিকে চায়। রবি মুচকি হেসে বলে, ও পড়ে গিয়ে চোট পায়, সেজন্য তাড়াতাড়ি জল আনতে হয়।

নন্দবাবু অজয়কে জিজ্ঞাসা করেন, কি করে পড়ে গেলে?

এবার মিথ্যা কথা বলার পালা অজয়ের। সে বোঝে ছেলেরা নিজেদের মধ্যে দুষ্টুমি মারামারি করলেও সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে নালিশ করা উচিত নয়। তাই বলে, কাপড়ে পা জড়িয়ে পড়ে যাই।

রমাপতিবাবু সস্নেহে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার লাগে নি তো?

অজয় ঘাড় নাড়ে। নন্দবাবু ছেলেদের দিকে চেয়ে গর্জে ওঠেন, কি দেখছো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? যাও, যে যার ঘরে যাও। খালি হৈ হৈ।

ছেলেরা নীরবে সরে পড়ে।

নন্দবাবু রমাপতিবাবুকে বলেন, সামনে ঐ আপনার ভাইপোর ঘর। ইচ্ছে করলে দেখে যেতে পারেন।

অজয়ের ঘর দেখে রমাপতিবাবু খুশী হন। বলেন, বাঃ, বেশ ঘর! আলো-হাওয়া দিব্বি আছে।

ঘরের অন্য তিনটি ছেলের দিকে চেয়ে রমাপতিবাবু বলেন, তোমরা তাহলে ওকে একটু দেখো, মিলে মিশে থেকো। বাড়ি ছেড়ে এই প্রথম বাইরে থাকছে।

কোণ হতে নির্মল দুহাতে জ্যাঠামশাইকে অভয়দানের এক অদ্ভুত ভঙ্গী করে বলে, আপনি কিছু ভাববেন না। আমরা সব ম্যানেজ করে নেবো।

নির্মলের ডেঁপোমিতে রমাপতিবাবু একটু অবাক হন। অজয়কে বলেন, আমি তাহলে এবার যাই, ট্রেনের সময় হয়ে এলো।

তিনি উঠে দাঁড়ান। অজয় তাঁকে ঢিপ করে কোন রকমে একটা প্রণাম করে। সমবয়সী অপরিচিত ছেলেদের সামনে প্রণাম করতে তার একটু বাধা লাগছিল। রমাপতিবাবু সস্নেহে অজয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, থাক্, থাক্। পকেট হতে একখানা পাঁচ টাকার নোট বের করে বলেন, এই নাও পাঁচটা টাকা। তোমার কাছে রাখো, ইচ্ছে মত খরচ ক'রো। একটু এগিয়ে কি মনে পড়ায় ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, রাত্রে শোবার সময় মশারিটা ভাল করে গুঁজে নিয়ো। আচ্ছা, আমি চলি।

তিনি চলে যান। অজয় স্যুটকেস খুলে জিনিসপত্র গোছান শুরু করে। শৈলেন প্রশ্ন করে, আচ্ছা ভাই, তোমার জ্যাঠা-মশাই মশারি গোঁজার কথা বল্লেন কেন?

কি জানি কেন। কথাটায় কোন গুরুত্ব আরোপ না করে অজয় জবাব দেয়।

পড়ার বই হতে মুখ তুলে শান্ত কণ্ঠে শক্তি বলে, আমি বলতে পারি কেন।

সকলে সাগ্রহে তার দিকে চায়। অজয় অবাক হয়ে দেখে শক্তিকে—সুন্দর চেহারা, কালো দুটি চোখে প্রশান্তি ও বুদ্ধির ছায়া। তার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর সংগীতের মত মনে হয়। শক্তি বলে, তোমার নিশ্চয়ই মা আছেন।

—আছেন।

জ্যাঠামশাই নিশ্চয় তোমায় খুব ভালবাসেন।

গম্ভীরভাবে অজয় বলে, না।

শক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলে, নিশ্চয়ই বাসেন। তাই ও কথা বলেছেন।

অজয় চুপ করে থাকে। নির্মল বলে, কি করে বুঝ্‌লি তুই?

শক্তি আস্তে আস্তে ব্যাখ্যা করে, উনি ভাল না বাসলে ওর সুবিধে-অসুবিধের দিকে এমন চোখ থাকতো না। আর মা আছেন কি করে বল্লাম? মশারি গোঁজার মত সামান্য কাজও ওকে করতে হয় না, আর একজন সযত্নে করে দেয়—জ্যাঠা-

মশাইয়ের কথা থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল। মা ছাড়া আর কে এমন যত্ন করবে ?

শক্তির বিশ্লেষণী বুদ্ধি অজয়কে আকৃষ্ট করে। সে সপ্রশংস কণ্ঠে বলে, বেশ বুদ্ধি তো তোমার! তোমারও নিশ্চয় মা আছেন আর তোমায় খুব ভালবাসেন ?

শৈলেন বলে, হ্যাঁ, ওর মা লুকিয়ে লুকিয়ে প্রায়ই কত খাবার আনে।

—তোমাদের বাড়ী বুঝি কাছেই ?

—ওদের বাড়ি-টাড়ি নেই। ওর মা কাছেই একটা বাড়িতে কাজ করে। তাচ্ছিল্যভরে শৈলেন বলে।

একটু চিন্তিত হয়ে অজয় প্রশ্ন করে, কাজ ? কি কাজ ?

ওর মা ঝি-গিরি করে। নিদারুণ অবজ্ঞা ফুটে ওঠে শৈলেনের কথায়।

শক্তি লজ্জায় মাথা নত করে। সংসারে গরিব হওয়ার মত অপরাধ বুঝি আর নেই। শৈলেনের কথা বলার ঢং দেখে শক্তির জন্য অজয়ের মনের কোণে যেন একটু ব্যথা জাগে।

ঘরের অস্বস্তিকর অবস্থা দূর করার জন্য নির্মল শৈলেনকে ধমক দিয়ে বলে, কেন মিছিমিছি রাগাচ্ছিস ? না, না, ওর মা রান্না করে।

শক্তি পড়ার বইয়ে মনোনিবেশ করে। অজয় নিজের জিনিসপত্র গোছান শুরু করে। একটু বাদে খাবারের ঘণ্টা

বাজে। নির্মল ও শৈলেন তাড়াতাড়ি বই বন্ধ করে উঠে পড়ে। নির্মল বলে, শক্তি অজয়কে নিয়ে আয়।

অজয় তখন জামা-কাপড়ের গাদা হতে তার বল খেলার 'নি-ক্যাপ' ইত্যাদি বের করছে। শক্তি আস্তে আস্তে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে অজয়ের জিনিসপত্রগুলির উপর চোখ বুলায়, বলে, বাঃ, তোমার তো অনেকগুলো নি-ক্যাপ!

অজয় আপন মনেই বলে, তুমি নেবে দুটো? নাও না!

—না, থাক।

—লজ্জা কিসের? আমার অনেকগুলো আছে, খেলার সময় স্বচ্ছন্দে তুমি নিতে পারো।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শক্তি বলে, না, লাগবে না।

—কেন? শক্তির কথায় অজয় ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে চায়। এতক্ষণ শক্তি বসে ছিল তাই অজয় টের পায় নি শক্তি খোঁড়া। আকস্মিক বিস্ময়ের ধাক্কায় তার বাক্ রুদ্ধ হয়। মনে মনে ভাবে ছেলেটির কি দুর্ভাগ্য!

শক্তি ডাকে, এসো অজয়!

হ্যাঁ, চলো।

শক্তি 'ক্রাচে' ভর দিয়ে এগোয়, অজয় তাকে অনুসরণ করে।

রাত্রি দশটায় শোবার ঘণ্টা বাজে। ছেলেরা সব বই বন্ধ করে শয়নের উদ্যোগ করে। অজয় বসে মাকে এক চিঠি লিখতে।

আসার সময় মা বার বার করে বলে দিয়েছিলেন গিয়ে

নিয়মিত চিঠি দেবার জন্য। কিন্তু এর আগে কারুকে কখনো চিঠি লেখে নি সে। চিঠি লিখতে বসে কি লিখবে কেমন ভাবে লিখবে অজয় ভেবে পায় না। চোখ-মুখ কুঁচকিয়ে মাঝে মাঝে কাগজে আঁকিবুকি কাটে।

শক্তি এক সময় প্রশ্ন করে, কি ভাবছো?

—মাকে কেমন ভাবে চিঠি লিখবো তাই ভাবছি।

নির্মল বলে, কেন স্কুলে তো লেটার-রাইটিং শিখিয়েছে।

শৈলেন বলে, দূর! ঐ স্কুলের শেখানো মত পাদপদ্মে শতকোটি প্রণামপূর্বক অধীনের নিবেদনমিদং করলে পোস্টকার্ডের আধখানা ভর্তি হয়ে যাবে।

শক্তি বলে, অতো ভাবার কিছু নেই, অজয়! তোমার মনে যা আসে তাই লেখো!

অজয় যাহোক লিখে পোস্টকার্ড ভর্তি করে। ইতিমধ্যে ঘরের সকলে শুয়ে পড়েছে, তারও ঘুম পায়, হাই ওঠে! সমস্ত চিঠির উপর সে একবার চোখ বুলায়—

মা-মাগো,

তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। মন খুব খারাপ। তবে হোস্টেলটা খুব খারাপ লাগছে না। অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে! আমার ঘরে একজন ভাল ছেলে থাকে। দু'একটা দুষ্টু ছেলেও এখানে আছে, তারা আমাকে আসার সঙ্গে সঙ্গে জব্দ করতে চেয়েছিল। এমন মজা একদিন দেখিয়ে দেবো যে লাগতে সাহস পাবে না।

এখানে খুব ভোরে আমাকে উঠতে হবে। সকাল-সন্ধ্যে প্রার্থনা-গান গাইতে হবে। সকলের সঙ্গে গান গাইতে আমার লজ্জা করে। সকলের সঙ্গে স্নান করতে খেতে আমার লজ্জা করে না। খুব আমোদ আর হৈ চৈ সে সময়। রান্না কিন্তু বড্ড খারাপ। মাছের ঝোল যেন গঙ্গার জল! বিকেলে টিফিনে যে হালুয়া দেয় সেটা যেন ময়দার লেই, ঘুড়ি জোড়া চলে! খাওয়ার বড় কষ্ট হচ্ছে মা।

আর কি লিখবো খুঁজে পাচ্ছি না। প্রণাম জেন।

অজু

ঠিকানা লিখে আলো নিভিয়ে অজয় শুয়ে পড়ে। ছাত্রাবাসের সব ঘরের আলোও ইতিমধ্যে নিভে গেছে। চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

হঠাৎ অন্ধকার বারন্দায় দু-তিনটি ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে বের হয়। অজয়ের দরজার সামনে এসে তারা দাঁড়ায়, খুব সন্তর্পণে দরজায় টোকা মারে।

সন্তুশায়িত অজয়ের কানে সে শব্দ আসায় ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। বলে, কে?

বাইরে থেকে চাপা গলায় জবাব আসে, ভয় নেই! আমরা। দরজাটা খোল না ভাই! আলো জ্বেলে দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারটি ছেলে ঘরে ঢুকে পড়ে। তার মধ্যে দুজনকে অজয় চিনতে পারে—রূপ ও রবি—সকালে তাকে ফেলে দিয়েছিল আর মাথায় জল ঢেলে দিয়েছিল।

ঘরে ঢুকে তারা বেশ জাঁকিয়ে বসে চেয়ার টেনে নিয়ে এবং বিছানার উপরে। অজয়ের পাশে বসে অসীম বলে, এর মধ্যে ঘুমোবে? নতুন এলে, এসো আলাপ-টালাপ করি।

অজয় অবাক হয়ে বলে, এতো রাত্রে আলাপ!

রবি বলে, আরে রাত্রেই তো আড্ডা দেওয়ার সুবিধে। রামগরুড় ঘুমোয়।

অজয় প্রশ্ন করে, রামগরুড় কে?

রবি পেটটা ফুলিয়ে হাতের ভঙ্গীতে মোটা মানুষের অনুকরণ করে বলে, আরে, তুমি রামগরুড়কে চেনো না? সে আমাদের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট!

রবির অঙ্গভঙ্গীতে সকলে হেসে ওঠে। রবি কৃত্রিম গাম্ভীর্যভরে বলে, রামগরুড়ের ছানা, হাসতে তাদের মানা। হেসো না, হেসো না।

সবাই আবৃত্তি শুনে আরো জোরে হেসে ওঠে। হাসি থামলে রবি অজয়ের 'রুমমেট'দের দিকে চেয়ে বলে, ও! তোমাকে যে ঘণ্টা মেনে চলা ভাল ছেলেদের ঘরে দিয়েছে। আহা, কি রুমমেট! ঘণ্টা ধরে খায়, শোয়, ঘুমোয়—

ও পাশের বিছানা থেকে চাদরের মধ্য হতে শৈলেন লাফিয়ে উঠে বলে, মিছে কথা! কে ঘুমিয়েছে রে?

অজয় অবাক হয়। শৈলেন বিছানা হতে নেমে বলে, ঘুমোয় শক্তিটা আর ঐ নির্মলটা।

নির্মল পাশ ফিরে শুয়ে ছিল। নিজের নাম শুনে বিরক্তির সঙ্গে উঠে বসে। বলে, আঃ! বাজে বকা তোদের স্বভাব। কে, ঘুমিয়েছে কে ?

ওদের এতক্ষণ এই ঘুমের ভান করে পড়ে থাকায় সকলে হো হো করে হেসে ওঠে। বিস্মিত অজয় বলে বাঃ রে! সবাই দেখছি জেগে ঘুমোচ্ছিলে!

রবি বলে, ঘড়ি ধরে কারুর ঘুম হয়? এক ঐ শক্তিটার ছাড়া!

নির্মল বলে, হ্যাঁ রে রবি, তুই অজয়কে খারাপ ছেলে বল্লি কেন ?

রবি বলে, কখন ?

—ওই যে বল্লি, তোকে ভাল ছেলেদের ঘরে দিয়েছে! তার মানে ও যেন খারাপ ছেলে।

রূপ রবির হয়ে ওকালতি করে, না, না, খারাপ ছেলে বলে নি। রবি বলতে চায় ও আমাদের দলে। তোদের মত নিরীহ গোবেচারা নয়। বুঝেছিস্?

রবি বলে, ঠিক কথা! যা ঘুষি ঝেড়েছিল তখন!

শৈলেন বলে, তাই বুঝি ওকে দলে টেনে তোমাদের গাধা বেঞ্চের নেতা করতে চাও ?

অজয় প্রশ্ন করে, গাধা বেঞ্চ কি ?

নির্মল বলে, ক্লাসে ওরা যে বেঞ্চটায় বসে অঙ্কের মাস্টার ভূপেনবাবু তার নাম রেখেছেন গাধা বেঞ্চ।

রবি অজয়কে শোনায়, আমাদের সামনের বেঞ্চটার নাম গরুড় বেঞ্চ, তার সামনে গবেট বেঞ্চ, তার সামনে—

শক্তি কোন্ বেঞ্চে বসে? অজয় জিজ্ঞাসা করে।

—ফার্স্ট বেঞ্চে। রবি জবাব দেয়।

হঠাৎ বাইরে যেন কার পায়ের শব্দ শোনা যায়! রবি বলে, চুপ! চুপ! কে আসছে।

রবি উঠে দরজার কাছে গিয়ে বারান্দায় উঁকি মেরে দেখে বলে, ওরে ছোট রামগরুড়!

রবির কথা শুনে রূপ, অসাম প্রভৃতি নিমেষে খাটের তলায় লুকিয়ে পড়ে। শৈলেন আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দেয় আর নির্মল গভীর ঘুমে নাক ডাকায়। রবিও অজয়ের খাটের তলায় ঢুকতে যায়। অজয় তাকে জিজ্ঞাসা করে, কে আসছে?

—প্রিফেক্ট, পাঠশালার সর্দার পোড়ো জান তো? তাই। আমাদের দুষ্টুবুদ্ধি দেবে, একসঙ্গে বদমাইশি করবে, আবার বলে দিয়ে রামগরুড়ের কাছে সাধু সাজবে। সকালে ওই তো বল্লে তোমায় ফেলে দিতে।

দরজার কাছে আগন্তুকের ছায়া পড়ে। রবি খাটের তলায় অদৃশ্য হয়। ঘরে ঢোকে অমূল্য! অমূল্য চারদিক চোখ বুলিয়ে নেয়, তারপর অজয়কে জিজ্ঞাসা করে, তুমি এখনো শোওনি?

অজয় বলে, ঘুম পাচ্ছে না।

—হোস্টেলের নিয়ম সব শুনেছো ?

—হ্যাঁ।

—যা জিজ্ঞাসা করবো সত্যি উত্তর দেবে ?

—মিথ্যে আমি বলি না।

—এ ঘরে কে কথা বলছিল ?

খাটের তলায় রবির বুক ঢিপ ঢিপ করে। অজয় অমূল্যকে বলে, আমি।

—কার সঙ্গে ?

রূপের নিশ্বাস বন্ধ হয়, ভাবে অজয় বুঝি সবার কথা বলে দেবে। অজয় বলে, যাকে দেখা যায় না তার সঙ্গে।

ও। প্রেয়ার করছিলে ? আচ্ছা, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ো।

অমূল্য চলে যায়। ছেলেরা আস্তে আস্তে খাটের তলা হতে বেরিয়ে যে যার ঘরে যায়।

পরদিন অজয় হোস্টেলের সব ছেলের সঙ্গে যথা সময়ে স্কুলে যায়। শৈলেন, নির্মল, রবি প্রভৃতি অজয়কে স্কুলের লাইব্রেরি, জিমন্যাসিয়াম, খেলার মাঠ ইত্যাদি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখায়। স্কুলটা অজয়ের বেশ ভাল লাগে। পাড়াগাঁয়ের ছেলে এতবড় বাড়ি ও ব্যবস্থা দেখে খুশীই হয়।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজে। সকলের সঙ্গে অজয় ক্লাসে গিয়ে বসে। 'রোল কল' শুরু হয়। সকলের হাজিরা শেষে অজয়কে নবাগত দেখে শিক্ষক ব্রজেনবাবু হাতের ইঙ্গিতে তাকে উঠে কাছে আসতে বলেন।

নিজের জায়গা হতে উঠে দু'সারি বেঞ্চের মাঝ দিয়ে অজয় এগিয়ে চলে। অমূল্যর কাছ দিয়ে যাবার সময় সে চুপি চুপি অজয়কে বলে, খুব চেঁচিয়ে কথা বলবে। উনি কালা।

অজয় এগিয়ে যায়। অমূল্য তার পাশের ছেলেকে বলে, এইবার কি রকম মজা হবে দেখবি!

ব্রজেনবাবু অজয়কে জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ স্কুল থেকে এলে?

অজয় চেঁচিয়ে বলে, ঊষাগ্রাম হাই স্কুল।

উচ্চ স্বর শুনে ব্রজেনবাবু বিরক্তিপূর্ণ ভ্রূকুটি করে অজয়ের দিকে চান। অজয় ভাবে তার কথা তিনি শুনতে পান নি। তাই আরো জোরে চেঁচায়, ঊষাগ্রাম!

ক্লাসসুদ্ধ ছেলে হো হো করে হেসে ওঠে। ব্রজেনবাবু

রেগে ধমক দেন। ইডিয়ট! ওরকম ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছো কেন?

—আপনি শুনতে পাবেন বলে, অজয় আবার চেঁচিয়ে ওঠে।

—ইয়ারকি করার আর জায়গা পাওনি? বলেই ব্রজেনবাবু টেবিলের উপর হতে রেজিস্টারটা তুলে অজয়কে দমাদম মার শুরু করেন। শুনতে পাবো? তোমার ঐ সানাইয়ের মত স্বর কালা লোকেরও কান ঝালপালা করে দেয়!

রেজিস্টার রেখে ব্রজেনবাবু বেত ধরেন। বেশ ঘা কতক বসিয়ে বলেন, যাও, বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাকগে যাও! মনিটর, এর পরের পিরিয়ডও ও দাঁড়িয়ে থাকবে।

অমূল্যকে পার্শ্বোপবিষ্ট গোবিন্দ বলে, মিথ্যে কথা বলে মিছিমিছি নতুন ছেলেটাকে মার খাওয়ালি।

অমূল্য মুচকি হেসে বলে, বউনি ভাল হলো। মার খেয়ে বনেদ শক্ত হবে।

অজয় বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে তীব্র দৃষ্টিতে অমূল্যর দিকে একবার চায়। ক্লাসে শিক্ষক না থাকলে সে অমূল্যকে মজা বুঝিয়ে দিত।

ব্রজেনবাবু পড়িয়ে চলেন। কি যে পড়ান কিছুই অজয়ের মাথায় ঢোকে না, কারণ রাগে আর অপমানে তার মাথা গরম হয়ে রয়েছে।

পিরিয়ড শেষ হওয়ার ঘণ্টা বাজে।

ব্রজেনবাবু চলে যান। অমলবাবু আসেন।

অজয়কে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি প্রশ্ন করেন, তুমি দাঁড়িয়ে কেন ?

অমূল্য বলে, ও চেঁচিয়েছিল, স্যার।

—নতুন এসেই চেঁচামেচি! বিরক্তির সঙ্গে অমলবাবু বলেন। তিনি নিরীহ শান্তিপ্রিয় শিক্ষক। নতুন ছেলে সম্বন্ধে তাঁর মনে এক বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়।

রবি উঠে দাঁড়িয়ে অমূল্যর কথার প্রতিবাদ করে বলে, অন্যের কথা শুনে ভুল করে চেঁচিয়েছিল।

—তার মানে ? অন্যের কথায় ভুল করে চেঁচিয়েছে ? কচি খোকা! অন্যে যদি বলে ঘরে আগুন দিতে, দেবে ? থাকুক দাঁড়িয়ে যেমন চেঁচিয়েছিল। সে দোষী বা নির্দোষ তা অনুসন্ধান করার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন না। শুধু বোঝেন এ ছেলেকে শাস্তি না দিলে শৃঙ্খলা রক্ষা করা দুরূহ হবে।

অমলবাবুর পিরিয়ডের পর টিফিন হয়। ছেলেরা ক্লাস হতে বাইরে যায় খেতে এবং খেলতে। অজয় চুপচাপ নিজের সীটে বসে থাকে মাথা নীচু করে। প্রথম স্কুলটা তার খুবই ভাল লেগেছিল, এখানে এসে এবার মন দিয়ে লেখাপড়া শুরু করবে ভেবেছিল। কিন্তু বিনাপরাধে মার খেয়ে তার মনটা সব কিছুর উপর বিরূপ হয়ে উঠেছে।

শক্তি এসে আস্তে আস্তে অজয়ের পাশে বসে। জিজ্ঞাসা করে, টিফিনে বাইরে যাবে না ?

—না।

—কিছু খাবে না ?

—না।

—স্কুল তোমার ভাল লাগছে না ? মন খারাপ হয়েছে ?

অজয় নীরব থাকে। তার চোখ দুটি ছলছল করে ওঠে।

—বুঝেছি। শক্তি গম্ভীরভাবে বলে।

—শুধু শুধু মার খেলাম সকলের সামনে। অজয় মনেরকথা বলে।

—তার জন্য লজ্জা করার কিছু নেই। তুমি তো কোন দোষ করো নি। শক্তি বন্ধুকে সান্ত্বনা দেয়।

—বড় হয়ে আমি স্কুলে মার দেওয়া বন্ধ করে দেবো।

—খুব ভাল হয় তাহলে। শক্তি অজয়কে সমর্থন করে। অজয়ের কথায় ব্যক্ত হয় সমস্ত কিশোর ছাত্রের সংকল্প।

শক্তি পকেট হতে এক মুঠো চীনাবাদাম বের করে অজয়ের দিকে এগিয়ে দেয়। অজয় নিতে ইতস্তত করে। শক্তি বলে, লজ্জা কিসের ? নাও !

শক্তি অজয়ের হাতে চীনাবাদাম গুঁজে দেয়, দুজনের মধ্যে সংকোচের সব বাঁধ ভেঙে যায়।

স্কুলের ছুটির পর বিকেলে হোস্টেলে ফিরে ছেলেরা সব মুখ-হাত-পা ধুয়ে কিছু খেয়েই বল খেলতে নামে।

অজয় শক্তিকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বিকেলে কি করো ?

—কিছু না।

—একা চুপচাপ ঘরে বসে থাকো ?

—না। হোস্টেলের পিছনের বাগানে আমি একটা দোলনা খাটিয়েছি ; সেখানে গিয়ে দোল খাই, গল্পের বই পড়ি।

—চলো। আমি তোমার দোলনা দেখবো।

শক্তি সাগ্রহে অজয়কে নিয়ে যায় তার দোলনা দেখাতে। পঙ্গু বলে অন্যান্য ছেলেরা খেলার সময় তাকে পরিহার করে। সাথীবিহীন শক্তি এতদিনে সঙ্গী পাওয়ায় আনন্দিত হয়। বাগানটা অজয়ের খুবই ভাল লাগে। বড় বড় গাছের মাঝ দিয়ে পায়ে চলা সরু পথ তাকে তার গাঁয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। হোস্টেলের পিছন দিক বলে এদিকে বড় একটা কেউ আসে না। স্থানটার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে কুলায়াগত পাখির কাকলি। অস্তরবির রশ্মিরেখা পাতার বাধা ভেদ করে মাটিতে পড়ছে।

অজয় অস্ফুট স্বরে বলে, বাঃ, চমৎকার !

তোমার ভাল লাগছে ? অজয়ের জায়গাটা ভাল লাগায় শক্তি মনে মনে খুব খুশী হয়। সামনে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সে বলে ঐ আমার দোলনা।

অজয় দ্রুতপদে দোলনার কাছে এগিয়ে যায়। শক্তিকে ডাকে, এসো, আজ আমি তোমার সঙ্গে দুলবো।

—সেকি ! তুমি বল খেলতে যাবে না ?

—না।

—কেন? খেলতে ভাল লাগে না? অতগুলি নি-ক্যাপ ইত্যাদির অধিকারী অজয়ের খেলার প্রতি বীতরাগ শক্তির বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

অজয় অকপট স্বীকারোক্তি করে, খেলতে ভাল লাগে। কিন্তু তোমাকে আরও ভাল লাগে।

সকলের অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের পাত্র দরিদ্র পঙ্গু শক্তি অজয়ের এই কথায় মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। ধীর শান্ত কণ্ঠে অজয়কে বলে, তাহলে আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু।

—বেশ তো। চলো দোলনায় চাপা যাক।

অজয় ও শক্তি দুই বন্ধু দোলনায় বসে মনের সুখে দোল খাওয়া শুরু করে।

এদিকে খেলার মাঠে খেলা শুরু হওয়ার আগে রবি বলে, দাঁড়া! নতুন ছেলে অজয়কে ডেকে আনি।

নির্মল বলে, অজয় খুব ভাল খেলে। ট্রাঙ্কে ওর অনেক মেডেল আছে খেলার; আমাকে দেখিয়েছে।

রবি ও অন্যান্য ছেলেরা অজয়ের ঘরে আসে তাকে ডাকতে, কিন্তু সেখানে না পেয়ে চারদিকে খোঁজা শুরু করে দেয়। শেষে বাগানে রবি ওদের দুজনকে আবিষ্কার করে। দোলনার কাছে এসে অজয়কে বলে, আরে, তুমি এখানে! আর তোমার জন্য ওদিকে টীম হচ্ছে না।

অজয় বলে, আমি আজ খেলবো না।

রবি একটু অবাক হয়ে বলে, সে কি! কেন?

দোল খেতে খেতেই অজয় বলে, আমি আজ দোলনায় দোল খাবো।

এবার রবি রীতিমত অবাক হয়ে বলে, ফুটবল না খেলে দোল খাবে? দোলনা তো ঐ ল্যাংড়া শক্তির জন্য।

শক্তিকে রাতদিন ল্যাংড়া বলবে না বলছি, গম্ভীরভাবে অজয় বলে।

ল্যাংড়াকে ল্যাংড়া বলবো না তো কি বলবো? নিরীহের মত রবি জিজ্ঞাসা করে।

—কিছু বলবে না।

—ভাল। কিছু বলবো না। রবি ধীর পদে প্রস্থান করে।

ইতিমধ্যে অন্যান্য ছেলেরা সব এসে একটু দূরে অপেক্ষা করছিল। রবি কাছে আসতেই রূপ জিজ্ঞাসা করে, আসবে না?

না, রবি বলে। অজয়ের প্রত্যাখ্যানে সে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

অমূল্য বলে, ল্যাংড়াটার সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে তো!

—আর ল্যাংড়া বলো না, অজয় তাহলে মজা দেখিয়ে দেবে।

তাই নাকি? অমূল্যর মাথায় দুষ্টবুদ্ধি জাগে। সে সকলকে বলে, বেশ, কেউ ল্যাংড়া বলবে না। বুঝেছো? ল্যাংড়া মুখে বলবে না।

এই কথা বলেই সে পার্শ্ববর্তী দুটি ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে একটি পা মুড়ে পঙ্গু শক্তিকে অনুকরণ করে। শক্তি যেমন ভাবে

'ক্রাচে' ভর দিয়ে হাঁটে, তেমনি ভাবে সে হেঁটে স্থান ত্যাগ করে। ছেলেরা তার অঙ্গভঙ্গী দেখে উচ্চ কণ্ঠে হেসে ওঠে।

ছেলেদের হাসি শুনে অজয় শক্তি পিছনে চায়। অজয় দোলনা হতে লাফিয়ে উঠে অমূল্যকে আক্রমণ করার জন্য দৌড়বার উপক্রম করে। কিন্তু শক্তি তার হাত ধরে ফেলে শান্ত কণ্ঠে বলে, যেতে দাও ওদের। আমি তো কিছু মনে করি না।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে অজয় বলে, একদিন ওদের আমি মজা দেখিয়ে দেবো।

দোল খেতে খেতে হঠাৎ শক্তি দেখতে পায় দূরে তার মা আসছেন। অজয়কে সে বলে, ঐ মা আসছে। একটা মজা করবে? লুকিয়ে পড়া যাক! মা এসে খুঁজে পাবে না। কেমন মজা হবে? চলো—চলো—

মার সঙ্গে মাঝে মাঝে শক্তি এই রকম লুকোচুরি খেলে। মা-ই হচ্ছেন তার একমাত্র খেলার সাথী।

মা দোলনার কাছে এসে ছেলেকে খোঁজেন। চারদিকে চেয়ে ডাকেন, খোকা। খোকা, কোথায় গেলি? ও খোকা—না বাপু, আর খুঁজতে পারি না। আয় বাবা! শুনে যা, খোকা—

এক গাছের আড়াল হতে শক্তি সাড়া দেয়, এই যে মা।

যেদিক হতে সাড়া এসেছে সেদিকে দু'পা এগিয়ে মা বলেন, কইরে?

—এই তো। একটু এগিয়ে এসো! উঁকি মেরে শক্তি বলে।

মা গাছের দিকে অগ্রসর হন। শক্তি গাছের আড়াল হতে বেরিয়ে এসে পিছন হতে মাকে জড়িয়ে ধরে।

—ওমা, তুই এখানে লুকিয়েছিলি! মা সস্নেহে ছেলেকে গাছের তলায় বসান এবং নিজেও তার পাশে বসেন। তারপর আঁচলের গিঁট খুলতে খুলতে বলেন, দেখ্, তোর জন্য আজ আমি কী এনেছি!

শক্তি গম্ভীরভাবে বলে, কেন তুমি এসব আনো, মা। ছেলেরা আমায় রাগায়, বলে তোর মা মনিব-বাড়ি থেকে চুরি করে আনে।

মা সাগ্রহে ছেলের জন্য খাবার বের করছিলেন, কিন্তু শক্তির কথায় তাঁর হাত দুটি নিশ্চল হয়ে যায়। বেদনাক্লিষ্ট কণ্ঠে বলেন, তুই তাদের কথা বিশ্বাস করিস?

—না, মা।

—তবে তোর বন্ধুদের বলিস না কেন আমরা গরিব হতে পারি কিন্তু চোর নই।

—তারা বিশ্বাস করে না, মা।

ম্লান মুখে মা বলেন, তাই বটে। আজ তো আমাদের সে অবস্থা নেই যে বিশ্বাস করবে। কিন্তু তুই জেনে রাখ্ খোকা এগুলো আমি কোথা থেকে আনি। বড়লোকের বাড়ি কাজ করি, তাদের ফেলাছড়ার কিছুটা ভাগ আমার বরাতে জোটে, তাই আমি তোর জন্য নিয়ে আসি।

বয়সের তুলনায় শক্তির বুদ্ধিটা বেশ বেশীই। তাই সে

সহজেই বোঝে, ধনী পরিবার যা অপচয় করে তারই সামান্য অংশ তার মা সংগ্রহ করে স্নেহবশে তার জন্য নিয়ে আসেন। এই নিয়ে আসাটা অন্যায় নয়, অন্যায় হচ্ছে ধনীদের অযথা অপচয়টাই। তবু সে বলে, কিন্তু এমনি করে খেতে আমার বড় লজ্জা করে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বলেন, আমারও কি লজ্জা করে না রে এমনি ভাবে আনতে। পেটের জন্য পরের বাড়িতে ভাত রাঁধতে হবে এ কি কোনদিন ভেবেছিলাম!

মার জন্য দুঃখে শক্তির মনের ভিতর কান্না গুমরে উঠতে চায়। ছেলেবেলার কথা তার অস্পষ্ট মনে পড়ে। তাদের অবস্থা বেশ ভালই ছিল, কিন্তু হঠাৎ বাবার মৃত্যুতে সমস্ত ওলট-পালট হয়ে যায়। তার অসহায় বিধবা মাকে আত্মীয়-স্বজনেরা ফাঁকি দিয়ে বিষয়-সম্পত্তি হস্তগত করে। নাবালক ছেলের হাত ধরে মাকে পথে দাঁড়াতে হয়। তবু তিনি ভেঙে পড়েন নি। ছেলেকে মানুষ করার মহৎ সংকল্প নিয়ে তিনি প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম শুরু করেন। কত দুঃখ-কষ্ট আর ঝড়-ঝাপ্টার ভিতর দিয়ে তাঁর দিন কেটেছে।

মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য শক্তি বলে, দুঃখ ক'রো না, মা! আমি তো শীগ্‌গিরই বড় হবো, তখন তোমায় আর চাকরি করতে দেব না।

ম্লান হেসে ছেলের মাথা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে মা বলেন, সেই আশাতেই তো বেঁচে আছি, বাবা। আমার এই নীচু মাথা তুই একদিন উঁচু করে তুলবি।

অজয় এতক্ষণ শক্তির নির্দেশ মত দূরের এক গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। অনেকক্ষণ হয়ে যাওয়ায় আস্তে আস্তে বেরিয়ে ডাকে, শক্তি!

—এসো, অজয়! মা, আমার বন্ধু অজয়। আমার ঘরেই থাকে। আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে। মার সঙ্গে অজয়ের আলাপ করিয়ে দেয় শক্তি। অজয় এগিয়ে এসে ওদের কাছে বসে।

মা বলেন, বাঃ, বেশ ছেলে! যা খাবার এনেছি দুজনে ভাগ করে খাও।

আঁচলের বাঁধা সন্দেশগুলি ওদের হাতে দেন। ইতিমধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। মা বলেন, আমি আজ আসি, বাবা। আমার আবার সময় হয়ে গেল।

মা চলে যান। শক্তি অজয় দুজনেই তাঁর যাবার পথের দিকে চেয়ে থাকে।

অজয় বলে, তোমার মাকে আমার খুব ভাল লাগল, শক্তি। ঠিক আমার মার মত।

হোস্টেলে অজয় ও শক্তি পাশাপাশি খেতে বসে। শক্তি লক্ষ্য করে অজয় কিছুই খেতে পারে না। ভাত মাখে, কোন রকমে দু'এক গ্রাস খায়, তারপর মাখা ভাত সরিয়ে রেখে অন্য উপকরণ দিয়ে খাবার চেষ্টা করে।

শক্তি বলে, তুমি যে কিছুই খেতে পারছো না।

অজয় বলে, কি করে খাই, যা বিশ্রী রান্না! আচ্ছা তোমরা খাও কি করে?

—খিদের জ্বালায় আর অনেক দিনের অভ্যাসের ফলে।

—তোমরা এর জন্যে কিছু করো না কেন ?

—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বহুবার বলা হয়েছে, কিন্তু কোন ফল হয় নি।

অজয় বোঝে প্রতিকারের পথ নেই, কোন রকমে পেট ভরাতে হবে।

ওদিকে ঠাকুর মাছের ঝোল পরিবেশন করছিল। রবি বলে, ঠাকুর আর একটা মাছ দাও।

ঠাকুর সাফ জবাব দেয়, আর মাছ নেই।

রবি বলে, কেন মাছ তো অনেক ছিল।

শৈলেন টিপ্পনী কেটে বলে, স্রেফ চুরি! ওর হাঁড়িতে খুঁজে দেখ্ না, পাবি।

ঠাকুর একটু রেগে গিয়ে বলে, মাছ না রইলে কিমতি মিলিবো।

তবে গেল কোথায় সব ? চালাকি পেয়েছো ? ধমক দিয়ে রবি বলে।

অমূল্য রবিকে উস্কে দিয়ে বলে, যা না, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বল্‌গে যা।

যাবই তো। চল্ তো, শৈলেন! রবি উঠে দাঁড়ায়।

শৈলেন জানে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে কিছু বলতে গেলেই ধমক খেতে হবে। তাই সে বলে, আবার আমায় টানাটানি কেন বাবা!

—তোদের কারো সাহস নেই সত্যি কথাটা বলবার। তোদের মুরোদ তো জানা আছে।

ছেলেদের সত্যি কারুর সাহস নেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সামনে যাবার, তাই সবাই নীরবে বসে থাকে। সকলেই রামগরুড়কে ভালভাবে জানে; এমনকি রবিরও আন্তরিক ইচ্ছা নেই রামগরুড়ের কাছে যাবার। সে শুধু মুখেই আস্ফালন করছে যাবে বলে; সত্যি যাবার হলে একাই চলে যেত।

চলো, আমি যাচ্ছি, নবাগত অজয় বলে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে সঠিক ভাবে সে এখনো চেনে নি। তাছাড়া অন্যান্য ছেলেরা যেখানে ভয় পাচ্ছে সেখানে আশৈশব দলপতি অজয় সাহস দেখাবার লোভ সামলাতে পারে না।

ও, তুমি যাবে? আচ্ছা, চলো। রবি কিন্তু রীতিমত ঘাবড়ে যায় সত্যি করে রামগরুড়ের সামনে দাঁড়াতে হবে ভেবে, অথচ এখন আর পিছনো চলে না।

তারা দুজনে খাবার ঘর হতে বের হয়। অমূল্য সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে অন্য ছেলেদের ইশারা করে ওদের পিছু পিছু গিয়ে মজা দেখার জন্য। মনে মনে এতক্ষণ সে এই চাইছিল।

নন্দদুলালবাবু নিশ্চিন্তে আহার করছিলেন। পাতের চারপাশে তাঁর পরিপাটি করে বাটি সাজানো। ছেলেরা কিছু খেতে পাক আর না পাক তাঁর কোন আহার্য বস্তুর অভাব হয় না। ছেলেদের রান্না খারাপ হয় বটে, কিন্তু ঠাকুর তাঁর জন্য স্পেশ্যাল রান্না করে।

রবি আর অজয় ঢুকতেই তিনি গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, কে? কি চাই?

তাঁর বজ্রগম্ভীর স্বর শুনে রবির মুখ শুকিয়ে যায়। কোন রকমে সে বলে, ঠাকুর স্তার মাছ দিচ্ছে না।

ব্যাপারটা ঠিকমত বোধগম্য না হওয়ায় তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তার মানে?

রবি যা বলবে ভেবে এসেছিল ভয়ে তার সব গোলমাল হয়ে যায়। সে গুছিয়ে কিছু বলতে পারে না। শুধু জানায়, অনেক মাছ এসেছিল, ঠাকুর বল্লে নেই।

মাছ অনেক এসেছিল! রবিকে ভেংচি কেটে রামগরুড় বলে, হেঁসেলের তো দেখছি গেজেট, পড়ার বেলায় অষ্টরম্ভা। হতভাগা কোথাকার!

ধমক শুনে রবির পেটের পিলে চমকে ওঠে। অজয় বোঝে রবির দ্বারা আর কিছু বলা সম্ভব হবে না। সে এবার তাই শুরু করে, ঠাকুর আমাদের মোটেই ভাল করে খেতে দেয় না।

বিকট মুখভঙ্গী করে রামগরুড় বলে, ভাল খেতে দেয় না! কি খাওয়াবে? কোপ্তাকারি, মোগলাই দোপেঁয়াজি? বাঁদর সব! নতুন এসে তুমিও হতচ্ছাড়াদের দলে জুটেছ? যাও, খেতে যাও!

রবি দ্রুতপদে পালায়, অজয় তাকে অনুসরণ করে। ঘরের কাছে যারা ভিড় করে এসেছিল মজা দেখার জন্য তারাও চুপি চুপি সরে পড়ে।

নন্দবাবু প্রকাণ্ড এক রুই মাছের মুড়োতে কামড় বসিয়ে আপন মনেই বলেন, যত সব হাড়-হাবাতে ছোঁড়া, নিশ্চিন্তে একটু খাবো তার জো নেই। মাছের খোঁজ! ঠাকুর, ক্ষীরটা নিয়ে এসো!

তিনি নিশ্চিন্তে আহার করেন।

আহারাদির পর ইজিচেয়ারে শুয়ে এক মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টোতে উল্টোতে নন্দদুলালবাবু তন্দ্রাচ্ছন্ন হন। এটি তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাস। হোস্টেলের নিয়ম হচ্ছে রাত্রের আহারের পর দশটা পর্যন্ত পাঠাভ্যাসের সময়, তার আগে কোন ছেলে শয়ন করতে পারবে না। হোস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসাবে তিনি সেইজন্য যথাসাধ্য নিয়মটি মানার চেষ্টা করে ছেলেদের সামনে আদর্শ স্থাপন করতে ইচ্ছুক। কিন্তু বিছানায় তিনি শয়ন না করলেও চেয়ারেই তাঁর সুনিদ্রা হয়। অবশ্য তাঁর নাসিকাগর্জনের জন্য দায়ী গুরু ভোজন, তিনি নন।

আজ তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে অমূল্যর মৃদু আহ্বানে। চুপি চুপি অমূল্য ডাকে, স্যার—স্যার—

নিদ্রাজড়িত নয়ন দুটি ঈষৎ উন্মুক্ত করে নন্দবাবু বলেন, কে?

—আমি অমূল্য।

—কি হয়েছে? নন্দবাবু চোখ মেলে চান।

—স্যার! অজয় সব ছেলেকে খাবার ঘরে জুটিয়ে আপনাকে জব্দ করার মতলব আঁটছে।

তন্দ্রাচ্ছন্ন নন্দবাবুর মস্তিষ্কে অমূল্যর কথাটা অদ্ভুত আলোড়ন তোলে। তিনি ধীরে ধীরে সমস্ত কথাটা বোঝার চেষ্টা করেন। তাঁকে জব্দ করার মতলব আঁটছে ছেলেরা? এতবড় দুঃসাহস কার কার হয়েছে ভাল করে জানার জন্য তিনি প্রশ্ন করেন, কে মতলব আঁটছে?

—অজয়, স্যার।

—আচ্ছা, তুমি যাও। আমি দেখছি।

অমূল্য চলে যায়। নন্দবাবু টেবিলের উপর রক্ষিত বেতটি তুলে নেন। অজয় ছোঁড়াটা নতুন এসেই পালের গোদা হয়ে উঠেছে। না, ভাল করে শিক্ষা দিতে হবে। নন্দবাবু আস্তে আস্তে ঘর হতে বের হন।

খাবার ঘরে ছেলেদের রীতিমত গোপন সভা বসেছে। ছাত্রাবাসের আহার সম্বন্ধে সব ছেলেরই মনে অসন্তোষ জমে আছে। আজ অজয় ও রবির নালিশের মধ্যে দিয়ে তাদের সকলেরই অভিযোগ পরোক্ষে প্রকাশিত হয়েছিল। তাই অজয় ও রবি যখন এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সকলকে আহ্বান করে গোপনে মিলিত হয়ে প্রতিকারের পথ খোঁজার জন্য, তখন সকলেই প্রায় যোগ দেয় তাদের সঙ্গে। শুধু দু'একজন ভীতু ও ভাল ছেলে আসেনি গণ্ড-গোলের ভয়ে; আর আসেনি ছাত্রাবাসের ছাত্রদের বিশ্বাসঘাতক বন্ধু অমূল্য।

ছেলেদের অজয় বলে, রামগরুড়কে কিছু বলতে গেলে ধমক খেতে হয়। তাই আমাদের উচিত আমাদের অসুবিধার কথা হেডমাস্টারকে জানানো।

শৈলেন বলে, রামগরুড় কিন্তু ভীষণ চটে যাবে এই ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার জন্য।

অজয় বলে, অতো ভয় করলে চলে না। তোমরা যদি আমার সঙ্গে থাক আমি সব ব্যবস্থা করবো।

রূপ বলে, আমরা তো আছিই তোমার সঙ্গে।

নির্মল, রবি প্রভৃতি সায় দেয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

সকলের দিকে চেয়ে অজয় বলে, ঠিক তো? দেখো—শেষে যেন রামগরুড়ের ভয়ে ইঁদুরের গর্ত খুঁজো না!

ঠিক এই মুহূর্তে দরজার কাছে নাটকীয় আবির্ভাব হয় নন্দবাবুর। তিনি ডাকেন, অজয়!

ঘরের মধ্যে যেন বাজ পড়ে! চকিতে ছেলেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। দেয়ালের কোণে, বেঞ্চের তলায় সব আত্ম-গোপন করার চেষ্টা করে। যারা নেহাৎ সামনা-সামনি পড়ার জন্য পালাতে পারে না তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে। হাতের বেতটা শূন্যে আন্দোলিত করে নন্দবাবু বলেন, এখানে সব কি করছো? কেন ঘর ছেড়ে এসেছো?

ঢোঁক গিলে ভীত কণ্ঠে রূপ বলে, অজয় আমাদের ডেকেছে।

নন্দবাবু গর্জন করে ওঠেন, ডাকাচ্ছি ভাল করে। হোস্টেলের

নিয়ম না মানলে দূর করে দেবো সব। যত নষ্টের গোড়া তুমি! মার না দিলে ঢিট্ হবে না।

তিনি অজয়ের দিকে এগিয়ে আসেন। দরজার কাছ হতে তিনি সরে আসায় চক্ষের পলকে মুক্ত দ্বারপথে অন্যান্য ছেলেরা অদৃশ্য হয়ে যায়। অজয়কে ধরে তিনি পিঠের উপর বেতটি আছড়ান শুরু করেন।

অজয় বল্লে, শুধু শুধু মারবেন না।

—মুখের উপর আবার চোপা! বাঁদর কোথাকার।

বেশ কয়েক ঘা মারার পর তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। বিশাল বপু নিয়ে প্রহার করার মত দৈহিক পরিশ্রমের কাজ বেশীক্ষণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। অগত্যা অজয়কে ছেড়ে দিয়ে তিনি কপালের ঘাম মোছেন। ইতিমধ্যে অবশ্য অজয়ের দেহের মধ্যে কয়েক জায়গায় কালশিটে পড়ে গেছে। মুখ বুজে সে প্রহারের যন্ত্রণা সহ্য করে। চিরদিনের দুষ্টু ছেলে অজয় মার খেতে অভ্যস্ত।

প্রহৃত অজয় নিজের ঘরে ফিরে এসে বসে। হোস্টেলের সমস্ত ছেলের উপর তার মনে মনে ভীষণ রাগ হয়। যত সব কাপুরুষের দল! মারের ভয়ে তাকে স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করে পালিয়ে গেল। তার গ্রামের ছেলেরা হলে নিশ্চয়ই তাকে এমন অসহায় অবস্থায় ফেলে পালাতো না। তাই রবি প্রভৃতি চুপি চুপি যখন এসে তার পাশে বসে, তখন সে তাদের দিকে দৃক্‌পাত করে না।

অজয় মার খাওয়ার জন্য তার ব কিন্তু সত্যিই হয়েছে। অজয়কে আন্তরিক সমবেদনা জানাতে তারা গোপনে এসেছে। রবি আস্তে আস্তে তার গায়ের বেতের দাগগুলিতে হাত বুলিয়ে দেয়।

অজয় কিন্তু এক টানে রবির হাতটা সরিয়ে দেয়।

ব্যথিত কণ্ঠে রবি বলে, কি রে অজয়, আমাদের সঙ্গে কথা বলবি না?

অজয় চোখ তুলে তাদের দিকে চায়, কিন্তু কোন কথা বলে না।

অভিমানভরে রবি বলে, কথা বলবি না তো? বেশ!

দৃঢ় কণ্ঠে অজয় বলে, বলতে পারি, কিন্তু আমার কথা শুনে চলতে পারবি? বল!

—হ্যাঁ, পারবো। রবি বলে।

—গা ছুঁয়ে দিব্বি কর!

—করছি, বলে রবি অজয়ের গায়ে হাত দেয়। মনে মনে সে সংকল্প করে আর রামগরুড়কে ভয় করবে না।

উত্তেজিত কণ্ঠে অজয় বলে, এই মারের শোধ আমি নেবো, তবে আমার নাম অজয়।

অজয়ের সাহস ছেলেদের মনে নতুন উৎসাহ এনে দেয়। এতদিন রামগরুড় তাদের কাছে এক ভয়ংকর জীব ছিল, কিন্তু অজয় তাদের ভয় ভেঙে দেয় রামগরুড়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

পরদিন। ঠাকুর নন্দবাবুর জন্য স্পেশ্যাল সব রান্না শেষ করে বাটিতে সাজিয়ে রেখে যখন এককোণে গিয়ে ছেলেদের ভাতের ফেন গালছিল তখন পা টিপে টিপে অজয় ও রবি রান্না ঘরে ঢোকে। ঠাকুর দরজার দিকে পিছন ফিরে থাকায় তাদের আগমন একেবারেই টের পায় না। রবি ও অজয় তাড়াতাড়ি হাতের এক মোড়ক হতে মুঠো মুঠো নুন নিয়ে নন্দবাবুর ডাল-ঝোল-তরকারি প্রভৃতিতে ছড়িয়ে দেয়, তারপর যেমন ভাবে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে প্রস্থান করে।

নন্দবাবু খেতে বসে এক গ্রাস ভাত মুখে তুলেই মুখ বিকৃত করেন। মাখা ভাত সরিয়ে রেখে আর এক বাটির সামগ্রী পাতে ঢালেন। কিন্তু সেটি খেয়ে 'ওয়াক' করে উঠে মুখের ভাত মাটিতে ফেলে দেন। নুনে একেবারে বিষ হয়েছে! চীৎকার করে ডাকেন, ঠাকুর!—ঠাকুর!—

ঠাকুর দৌড়ে আসে। নন্দবাবু বলেন, রাস্কেল! নুনে সব পুড়িয়েছো।

অবাক হয়ে ঠাকুর বলে, আজ্ঞে—নুন—

নন্দবাবু গর্জে ওঠেন। আজ্ঞে নুন! নুন খাইয়েছেন যেন গুণ গাইবার জন্য! কিছু মুখে দেওয়া চলে না। দাও, আমার ক্ষীরটা দাও!

ঠাকুর শশব্যস্তে ক্ষীরের বাটি এগিয়ে দেয়। ক্ষীরে চুমুক দিয়ে নন্দবাবু প্রায় বমি করে ফেলেন। তরল পদার্থের

সঙ্গে প্রচুর নুন তাঁর গলার অভ্যন্তরে চলে যায়। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বাটি তিনি ঠাকুরের মুখে ছুঁড়ে মারেন। ঠাকুরের মুখ ও বুক ক্ষীরে প্লাবিত হয়ে যায়। সে বেচারার অবস্থা শোচনীয় হয় ভয়ে বিস্ময়ে। সে বুঝতে পারে না কি করে মিষ্টি দেওয়া ক্ষীরটা নোনতা হয়ে গেল।

—রাস্কেল! চেখে দেখো কতটা নুন দিয়েছো! নন্দবাবুর কথা শুনে ঠাকুরের সমস্ত বুদ্ধি গুলিয়ে যায়।

দরজার আড়ালে রবি লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের দুষ্কর্মের ফলটা স্বচক্ষে দেখার জন্য। রামগরুড় ও ঠাকুরের দুরবস্থায় তার ভীষণ আনন্দ হয়। নাচতে নাচতে সে উপরে অজয়দের কাছে আসে।

উপরের বারান্দায় সবাই অপেক্ষা করছিল রবির মুখ হতে 'প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ' শোনার জন্য। রবি ঘুরপাক খেয়ে নাচে, বলে, থ্রি চিয়ার্স ফর অজয়! হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে!

অজয় তাকে থামায়, এই চুপ, চুপ। কি হলো বল্।

—এক ঢিলে দুই পাখি। বাজিমাৎ! রামগরুড়ের ভীম একাদশী আর ঠাকুর ভূত সেজেছে।

ভূত শব্দটা অজয়ের কানে ঢোকা মাত্রই মস্তিষ্কে দুষ্টুবুদ্ধির এক বৈদ্যুতিক আলোড়ন হয়। সে বলে, দাঁড়া, এতক্ষণ মাথায় আসে নি। রামগরুড়কে ভূতের ভয় দেখাতে হবে।

রবি বলে, কিন্তু অমূল্যটা যদি বলে দেয়?

সকলেই একটু চিন্তিত হয়। অমূল্যর জন্য যদি তারা ধরা

পড়ে যায় তাহলে রক্ষা থাকবে না। অজয় একটু ভেবে নিয়ে বলে, বহুৎ আচ্ছা! ওর রুমমেটকে হাত করতে হবে। রাত্রে ও যখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে তখন ভূতে ওকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

রাত্রে অন্যান্য সকলে ঘুমোলে রবি, অজয়, নির্মল, শৈলেন প্রভৃতি জন কয়েক চুপি চুপি অমূল্যর ঘরের দরজায় টোকা মারে। ভিতর থেকে গোবিন্দ দরজা খুলে দেয়। ছেলেরা বিছানা সমেত অমূল্যকে সন্তর্পণে তুলে ঘর থেকে বের হয়। হোস্টেলের সামনের রাস্তায় নিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে তাকে শুইয়ে দেয়। রূপ অমূল্যর আপাদমস্তক ঢেকে দেয় চাদর দিয়ে। তারপর নিঃশব্দে যে যার ঘরে চলে যায়।

খানিক পরে রোঁদে বেরিয়ে এক পাহারাওয়ালা শবের ন্যায় শায়িত অমূল্যকে দেখে। আনমনে হাই তুলতে তুলতে সে পথ চলছিল, আচমকা হঠাৎ অমূল্যর কাছাকাছি এসে পড়ে চোখ রগড়ে তাকে দেখেই 'জয় সীতারাম' বলে লাফিয়ে উঠে দৌড় মারে। হাতের লাঠি তার সেখানেই পড়ে থাকে।

কিছু দূর দৌড়ে সে হাঁপাতে হাঁপাতে হাঁক মারে, জুড়িদার ভাইয়া হো!

বহু দূর হতে একজন সাড়া দেয়, হো-ও-ও—

দূরের পাহারাওয়ালা কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, কেয়া হুয়া?

কাঁপতে কাঁপতে প্রথম জন বলে, উধার একঠো—

-চোর ?

—নেহি। জিন্দা নেহি।

—রাম নাম সত্য হ্যায়। ভয়ে ভয়ে পাহারাওয়ালাটি আওড়ায়।

হোস্টেলের কাছাকাছি এসে অমূল্যর দিকে দেখিয়ে প্রথম জন বলে, তু যা কর্ পহলে দেখ্।

দ্বিতীয় জন আপত্তি জানায়, নেহি। তুহি যা।

—রাম নাম সত্য হ্যায়! প্রথম জন কাঁপতে থাকে।

—বহুৎ আচ্ছা। সামনা মোকামসে আউর আদমি বোলায় লে।

পাহারাওয়ালা দুজন হোস্টেলের দিকে চলে।

দরজায় দুম্ দুম্ ধাক্কা শুনে নন্দবাবুর ঘুম ভাঙে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে আসতেই ভীত সন্ত্রস্ত ঠাকুর তাঁকে বলে, বাবু পুলিস আউছন্তি।

ঠাকুরের পাশেই পুলিস দুটি দাঁড়িয়েছিল, তাদের একজন বলে, বাবু, আপকা কৌঠিকা সামনামে এক মুর্দা পড়া হ্যায়।

অ্যাঁ! এত রাত্তিরে মড়া আবার কোথেকে এলো? নন্দবাবু রীতিমত ঘাবড়ে যান। ঠাকুরকে বলেন, ডাক ডাক, ছেলেদের ডাক।

ঠাকুর চীৎকার শুরু করে দেয়, অমূল্যবাবু....এ...রবি বাবু...ইয়ে নির্মল বাবু...চঞ্চড় চলি আস।

চীৎকার শুনে ছেলেরা দৌড়ে আসে। নন্দবাবু তাদের

বলেন, দেখ, দেখ, হোস্টেলের সামনে একটা মড়া আবার কোত্থেকে জ্বালাতে এলো। কী ফ্যাসাদ!

ছেলেরা রাস্তার দিকে দৌড়য়। ঠাকুরকে নন্দবাবু বলেন, চল্, চল্, তুইও চল্। রামকে ডাক্।

ঠাকুর ইতস্তত করে এগোয়। নন্দবাবু তার পিছনে চলেন।

আচ্ছাদিত অমূল্যর চারপাশে সবাই ভিড় করে দাঁড়ায়। কিন্তু কেউই তার মুখের ঢাকা খুলতে সাহস করে না। রবি প্রভৃতি যারা সমস্ত ব্যাপারটা জানে তারাও নীরব থাকে, কতদূর ব্যাপারটি গড়ায় তাই দেখার লোভে।

নন্দবাবু রামকে হুকুম করেন, এই রাম, মুখটা খোল্ না দেখি।

রাম সাফ জবাব দেয়, এই রাত্তিরে মড়া ছুঁতে পারবুনি বাবু।

রবি হাসি চেপে গম্ভীরভাবে অনুমতি প্রার্থনা করে, আমি মুখের কাপড় সরিয়ে দেবো, স্তার?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দে বাবা দে। সস্নেহে নন্দবাবু অনুমতি দেন।

—এই সিপাইজী, তোমার ঐ লাঠিটা দাও তো, বলে রবি লাঠি দিয়ে অমূল্যর ঢাকা আস্তে আস্তে সরিয়ে দেয়।

আরে, এ যে অমূল্য! সকলের বিস্ময় সীমা ছড়ায়। নন্দবাবু ডাকেন, অমূল্য! অমূল্য!

অমূল্য চোখ মেলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। গাঢ় ঘুম হঠাৎ

ভাঙায় এবং চারপাশে এত ভিড় দেখে সেও রীতিমত অবাক হয়।

নন্দবাবু জিজ্ঞাসা করেন, তুমি এখানে এলে কি করে?

অ্যাঁ? অমূল্য কিছু বুঝতে পারে না। চারদিকে চেয়ে দেখে আম্‌তা আম্‌তা করে বলে, তাতো জানি না। ঘরেই তো ছিলাম!

যত সব বদমাইশি। চলো, হোস্টেলে চলো। ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখার জন্যে নন্দবাবু ব্যগ্র হন। সদলে অমূল্যর ঘরের কাছে এসে দেখেন দরজা যথারীতি ভিতর হতে বন্ধ।

কৃত্রিম বিস্ময়ে নির্মল বলে, আরে, দরজা তো ঠিক বন্ধ!

নন্দবাবু দরজায় সজোরে ধাক্কা দেন। ভিতর হতে নিদ্রা-জড়িত কণ্ঠে গোবিন্দ সাড়া দেয়, কে?

—দরজা খোল!

দরজা খুলে চোখ রগড়াতে রগড়াতে গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে, স্যার?

গম্ভীরভাবে নন্দবাবু জানতে চান, দরজা বরাবর বন্ধ ছিল?

গোবিন্দ কিছু বলার আগে তার হয়ে অমূল্য জবাব দেয়, আমি নিজে দরজায় খিল লাগিয়ে শুয়েছি, স্যার।

হুঁম্। নন্দবাবু একটু চিন্তিত হন।

রবি টিপ্পনী কাটে, আচ্ছা, ভূতুড়ে কাণ্ড তো!

নন্দবাবু গর্জে ওঠেন, চুপ করো, বাজে কথা বলো না। এ নিশ্চয়ই কারুর বদমাইশি। ভূত-টুত আমি জানি না। ধরতে

পারলে বেতের চোটে ভূতকে ঠাণ্ডা করবো। ও কি উড়ে গেল ওখানে? বলো কার বদমাইশি। এই বেলা স্বীকার করো। তুমি জানো রবি?

রবি ঘাড় নাড়ে।

নির্মল?

না, স্যার।

রূপ, তুমি জানো?

না, স্যার! ঘাড় নেড়ে রূপ বলে। তারপর অত্যন্ত নিরীহ গোবেচারার মত মুখভঙ্গী করে বলে, বোধ হয় স্যার নিশির ডাক।

নন্দবাবু সিংহনাদ করেন, ডাকাচ্ছি সব। বেতিয়ে ঢিট্ করবো। যাও, যে যার ঘরে যাও।

সকলে যে যার ঘরে চলে যায়। অমূল্য বেচারার সারারাত্রি ভয়ে ঘুম হয় না।

পরদিন রবি যখন অজয়ের ঘরে এক ফাঁকে আড্ডা দিতে আসে, তখন দেখে সে একটা রবারের বল পিন দিয়ে ফুটো করছে।

অজয় বলে, রামগরুড় বলেছে ভূতকে বেত মারবে! বেতের মত আজ রাত্রে ওকে কাঁপাবো দেখবি।

রবি বলে, জানিস অমূল্য আজ একটা প্রকাণ্ড তালা কিনে এনেছে। রাত্তিরে ঘরে লাগিয়ে শোবে।

তবে তো আমাদের রাস্তা সাফ, বলে অজয় বলটা এক গ্লাস জলে ডুবিয়ে সেটা দিয়ে পিচ্‌কিরি করে রবির গায়ে জল দেয়।

আহা হা, কী করছিস! রবি বলে।

দাঁড়া না। এটা তো সবে শুরু, তারপর কঙ্কাল নৃত্য আছে। আজ রাত্তিরে শুধু তুই আর আমি খেল্ দেখাবো। দশটার পর একটা বড় চাদর নিয়ে এখানে চলে আসিস, সাজগোজ করতে হবে।

মাঝ রাত্রে হঠাৎ নন্দবাবুর ঘুম ভেঙে যায়। কোথা হতে খানিকটা ঠাণ্ডা জল এসে তাঁর অনাবৃত দেহের উপর পড়ে। তাড়াতাড়ি উঠে তিনি আলো জ্বালেন। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে না যে তার ঝাপ্টা জানালা দিয়ে আসবে। ঘরটাও তাঁর একতলায়, ছাত ফুটো হয়ে জল পড়ার সম্ভাবনা কম। তাছাড়া চারদিক শুক্‌নো খট্ খট্ করছে, কেবলমাত্র তাঁর বিছানাটুকুই ভিজেছে। সমস্ত ব্যাপারটাই তাঁর কাছে রহস্যময় মনে হয়। চারদিকে তিনি সন্ধানী দৃষ্টি বুলোন, কিন্তু কিছুই বোধগম্য হয় না। যাহোক, আলো নিভিয়ে তিনি আবার শুয়ে পড়েন।

কিন্তু ঘুম আসার আগেই জানালার পাল্লার 'ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্' শব্দে চোখ মেলে তাকাতে বাধ্য হন। তাকিয়ে যা দেখেন তাতে তাঁর চোখ দুটি ছানাবড়া হয়ে ওঠে। জানালার পাল্লাগুলি বার দুয়েক আপনা হতে খুলে বন্ধ হয়ে থেমে গেল। তারপর ধীরে ধীরে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল এক বীভৎস লম্বা মূর্তি, সাদা

কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা। মাথায় ঘোমটা থাকলেও মুখ দেখা যায়। মুখে মাংস মোটে নেই।···কঙ্কালের করোটি। মূর্তিটির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এক অমানুষিক আর্তনাদও শোনা যায়। সে আর্তনাদ জীবিত লোকের হাড়ের মধ্যে শিহরন জাগিয়ে তোলে।

নন্দবাবু ভীষণ ভয়ে বিকট চীৎকার করেন, রাম···রাম··· অমূল্য···ঠাকুর····

তাঁর অর্তনাদে সারা হোস্টেল সচকিত হয়ে ওঠে। ছেলেরা ছুটে আসে।

—কি হয়েছে, স্যার ? কি হয়েছে ?

নন্দবাবুকে সবাই ঘিরে ধরে। তিনি বিছানার চাদরে মুখ ঢেকে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলেন। ছেলেরা আসতে সাহস পেয়ে ধীরে ধীরে মুখের ঢাকা অপসারিত করেন। ভয়ে ভয়ে জানালার দিকে চান।

রূপ জিজ্ঞাসা করে, কি দেখছেন, স্যার ?

ছেলেদের কাছে ভূতের আবির্ভাবের কথা বলবেন কি বলবেন না ঠিক করার আগেই নির্মল দৌড়তে দৌড়তে এস ঘরে ঢোকে। সে বলে, স্যার স্যার, এতো বড় মূর্তি স্যার! সাদা কাপড় পরা, মাঠের উপর দিয়ে চলে গেল। ওঃ, দেখে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

নির্মলের কথা শুনে রাম কাঁপতে কাঁপতে ভিড় ঠেলে সামনে এসে বলে, আমি আর মাঠের ঘরে থাকবুনি বাবু। রেতে আমি একা আর মাঠের ঘরে থাকবুনি।

সে বেচারা হস্টেলের বাগানের এক ধারে একটি ঘরে শুতো এতদিন। নন্দবাবু নিজেও খুব ভয় পেয়েছিলেন। রামের কথায় তাঁর খুব সুবিধা হলো। তিনি নিজের ভয় গোপন করার চেষ্টা করে বল্লেন, বেশ, বেশ, তোর যখন এতো ভয় তখন তুই আমার ঘরেই শুবি। বুঝলি? ভয় কি, অ্যাঁ, ভয় কি? তোমরা সব ভয় পেও না। যাও শুয়ে পড় গে।

অজয় ও রবি হাসি গোপন করে অন্যান্যদের সঙ্গে নন্দবাবুর কক্ষ ত্যাগ করে। আড়ালে গিয়ে নির্মলের পিঠ চাপড়ে দেয় তাদের শেখান মতো ভাল অভিনয় করার জন্য।

রবি বলে, রামগরুড় যা ভয় পেয়েছিল। আমি আর একটু হলে হেসে ফেলতাম।

অজয় বলে, দাঁড়া না, হয়েছে কি। এক মতলব মাথায় এসেছে। দুটো গাধা যোগাড় করতে হবে আর আনা দুয়েকের নস্যি।

কি হবে সব খুলে বল না, ভাই। নির্মল সাগ্রহে জানতে চায়।

অজয় বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে, লোহার সিক দিয়ে ওর ঘরের খিল খুলে গাধা ঢুকিয়ে দেবো। আর গাধাদের নাকে নস্যি গুঁজে দেবো যাতে ঘরের মধ্যে গিয়ে লাফালাফি করে।

অজয়ের কথা শুনে রবি নেচে উঠে বলে, রামগরুড়ের ঘরে এবার তাহলে ভূতের নাচ শুরু হবে!

পরদিন রাত্রে অজয় নন্দবাবুর ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে সরু সিক গলিয়ে ছিটকিনি সাবধানে খুলে ফেলে। নন্দবাবুর ঘন ঘন নাসিকাগর্জন শুনে সে বেশ নিশ্চিন্ত মনে দরজা খুলে দেয়, তারপর ইশারা করে রবিদের ডাকে। তারা সন্ধ্যার অন্ধকারে ধোপাদের দুটি গাধা হস্টেলে এনে লুকিয়ে রেখেছিল সবার অজ্ঞাতে। পিছনের মাঠে তাদের বেঁধে রেখেছিল এবং প্রচুর ঘাস-টাস খেতে দেওয়ায় গাধা দুটিও বিশেষ আপত্তি জানায়নি বা অকারণে চীৎকার করেনি। আস্তে আস্তে তারা সেই দুটিকে এনে নন্দবাবুর ঘরে পুরে দেয় এবং মহানন্দে নাচতে নাচতে নিজেদের ঘরে গিয়ে প্রতীক্ষা করে পরবর্তী ঘটনার।

গাধা দুটি অন্ধকার ঘরে ঢুকে প্রথমে একটু ঘাবড়ে যায়। তারপর চারদিকে চেয়ে আহার্য বস্তুর অনুসন্ধান করে। একটি গিয়ে ঘরের কোণে রক্ষিত খবরের কাগজের তাড়া চিবানো শুরু করে। আর একটি গিয়ে মেঝের উপর শায়িত রামের মাথার বালিশে কামড় মারে। ঘুমের ঘোরে রাম পাশ ফেরে।

খবরের কাগজ নেহাৎ নীরস লাগায় গাধাটি তা ত্যাগ করে খাটের ধারি হতে ঝুলে পড়া নন্দবাবুর গায়ের চাদরের খুঁটে টান মারে।

নন্দবাবু অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন। গাধার আকর্ষণে তাঁর গা হতে চাদর একটু সরে যাওয়ায় মশারা সেই নধর দেহ দংশন করবার সুযোগ পায়। মশার কামড়ে নন্দবাবুর সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয়। ঘুমের ঘোরেই তিনি চাদরটা ভাল করে টেনে গায়ে দিতে যান। কিন্তু চাদর টানতে গিয়ে টের পান কে যেন সেটা ধরে টানছে। দেহের উর্ধ্বভাগ হতে চাদরটা ক্রমশ পায়ের দিকে চলে যেতে চায়। এই অদ্ভুত আকর্ষণের ফলে নন্দবাবুর ঘুম একেবারে ছেড়ে যায়। ভয়ে ভয়ে তিনি পায়ের দিকে চেয়ে দেখেন। অন্ধকারের মধ্যে শুধু দেখতে পান কার যেন দুটি চোখ জ্বলজ্বল করছে। দারুণ ভয়ে তিনি বিকট চীৎকার করে ওঠেন।

তাঁর সেই চীৎকার শুনে রামের ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলার আগেই রাম টের পায় মুখের উপর ফোঁস করে কে যেন গরম নিঃশ্বাস ফেলল। গাধাটিও ইতিমধ্যে বালিশ ছেড়ে রামের মুখের উপর জিভ বুলায়। এক লাফে বিছানা ছাড়তে গিয়ে গাধার সঙ্গে রামের মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে যায়। অন্ধকারে সে কিছুই বুঝতে পারে না; শুধু বোঝে ঘরের মধ্যে অন্য কোন প্রাণীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভয়ে সেও চীৎকার করে ওঠে।

নন্দবাবু ও রামের চীৎকারে গাধা দুটো ভীষণ ভড়কে যায়। চার পা তুলে লাফাতে গিয়ে তারা চেয়ার-টেবিল উল্টে ফেলে। ঘরের মধ্যে অন্ধকারে শুরু হয় লাফালাফি—দাপাদাপি—চীৎকার—প্রলয় তাণ্ডব—নন্দবাবু খাটের উপর

হতে গড়িয়ে পড়েন—রাম ওল্টানো চেয়ারে হোঁচট খেয়ে ডিগবাজি খায়—গাধা দুটো ভয়ে উৎকট স্বরে ডেকে ওঠে—নন্দবাবু প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন—রাম কোন রকমে দরজার সন্ধান পেয়ে কোন দিকে না চেয়ে মুক্তকচ্ছ হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মারে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘরের মধ্যে এক নারকীয় কাণ্ড হয়ে যায়।

গোলমাল শুনে ছেলেরা ছুটে আসে। নন্দবাবুর কাঁপুনি আর কিছুতেই থামে না। টের পাওয়া যায় ভয় পেয়ে তাঁর জ্বর এসে গেছে। কম্বল মুড়ি দিয়ে তাঁকে বিছানায় শোয়ানো হয়। রূপ দুহাতে চেপে ধরেও তাঁর ভুঁড়িকম্প থামাতে পারে না। ছেলেরা তাঁকে ঘিরে বাকী রাত্রিটা জেগে বসে থাকে। নন্দবাবুর কাঁপুনির সঙ্গে গোঙানিও সমান তালে চলে।

সকাল হতেই একজন গিয়ে হেডমাস্টারকে খবর দেয় রাত্রের ভূতুড়ে কাণ্ডের। তিনি নন্দবাবুকে দেখতে আসেন।

নন্দবাবু কাঁপতে কাঁপতে বলেন, স্যার—স্যার—আমায় শীগ্‌গির দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। আর একদিনও আমি এখানে থাকতে পারবো না। ওরে বাবারে! উ···উ····বাবারে এ····এ···

হেডমাস্টার তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি ব্যবস্থা করছি। তারপর

ছেলেদের জিজ্ঞাসা করেন, হ্যাঁহে, রামের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি এখনো ?

নির্মল বলে, না, স্যার! সে বোধ হয় সোজা দেশে দৌড়েছে।

চিন্তান্বিত ভাবে হেডমাস্টার চলে যান নন্দবাবুর দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে।

রবি ও অজয় পরস্পরের দিকে একবার চেয়ে দেখে, তাদের চোখে চাপা হাসির বিদ্যুৎ চমকায়।

*　　*　　*　　*

স্কুলের সেক্রেটারির কাছে এক চিঠি এসে হাজির হয়। চিঠিটা পড়ে তাঁর মুখে চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে। সে সময় ঘরে তাঁর স্ত্রী ও এক বন্ধু উপস্থিত ছিলেন।

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন, কি হলো ? কোন দুঃসংবাদ ?

না, দুসংবাদ নয়। তবে অদ্ভুত সংবাদ। ভূতের ভয়ে হস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চাকরি ছেড়ে পালিয়েছে আর চাকরটা একেবারে নিরুদ্দেশ।

বন্ধু বলেন, সে কি! ভারী মজার খবর তো।

সেক্রেটারি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, মজা নয় ভাই, মজিয়ে দিলো। একে তো ছেলেরা সব কিম্ভুত, তার উপর ভূতের উৎপাত হলে হস্টেলই উঠে যাবে।

বন্ধু একটু হেসে বলেন, আমার কিন্তু বড় কৌতূহল হচ্ছে তোমার ঐ ভূতের রহস্যটা জানতে। আমার একটা অনুরোধ

রাখবে ? তোমার তো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পালিয়েছে, তা দিন কতক আমার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টগিরি করতে দাও না !

সেক্রেটারি এবং তাঁর স্ত্রী দুজনেই অবাক হয়ে বন্ধুর দিকে চান। বন্ধুটির খামখেয়াল অবশ্য তাঁদের অজানা নয়। তবু এ প্রস্তাবটা তাঁদের কাছে অবাস্তব মনে হয়। বন্ধুটি নাম করা সাংবাদিক এবং তাঁর পাণ্ডিত্যও অসাধারণ ; তাঁর পক্ষে সামান্য স্কুলের শিক্ষক হওয়া প্রায় অসম্ভব।

তাই সেক্রেটারি বলেন, সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করো না, শিশির। তুমি করবে মাস্টারি !

শিশিরবাবু বলেন, অবাক হবার কিছু নেই। বহুদিন ধরে সুযোগ খুঁজছিলাম ছেলেদের সঙ্গে একটু মেলামেশা করবার, আজ যখন সেটা পাওয়া যাচ্ছে তখন ছাড়তে আমি কিছুতেই রাজী নই।

বন্ধুপত্নী বলেন, কিন্তু আপনার কাগজের কি হবে ?

শিশিরবাবু বলেন, তার একটা ব্যবস্থা হবে। কাগজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলাম, এবার কাজের মধ্যে দিয়ে আনতে চাই।

সেক্রেটারি বলেন, সত্যি, ছেলেদের প্রকৃত মানুষ করার জন্য প্রয়োজন বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। অনেক আশা আর আদর্শ নিয়ে আমরা স্কুলটা স্থাপন করেছিলাম স্বাধীন দেশের সুন্দর মানুষ সৃষ্টি করার জন্য। কিন্তু কিছুই হলো না। ছেলেদের দুষ্টুমি আর মাস্টারদের অভিযোগে প্রাণ অতিষ্ঠ হলো।

অভিভাবকেরা স্কুলটাকে যেন একটা খোঁয়াড় মনে করেন ; ছেলে-দের দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচার জন্য সেখানে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হন। লেখাপড়া হোক না হোক স্কুলে ছেলে কয়েক ঘণ্টা আটক থাকলেই হলো। আর শিক্ষকরাও ছেলেদের শিক্ষিত করার বদলে কোন রকমে ক' পিরিয়ড চেঁচিয়ে চাকরিটা বজায় রাখেন।

শিশিরবাবু বলেন, দেখো, স্কুলের ছেলেদের সার্থক শিক্ষা না হওয়ার জন্য দায়ী আমাদের সমাজ। সমাজ আজও শিক্ষকদের উপযুক্ত মর্যাদা দেয় না বলে এই অধঃপতন। জাতির ভবিষ্যৎ যাঁদের উপর গড়ার ভার, পেট ভরে তাঁরা খেতে পান না। অন্ন চিন্তা তাঁদের অন্য সমস্ত চিন্তাকে ঢেকে রাখে।

সেক্রেটারি স্বীকার করেন, তা বটে।

শিশিরবাবু আরও বলেন, অবশ্য শিক্ষকদের দোষ নেই একথা আমি বলি না। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক আজ চোরে কামারের সম্পর্ক, হৃদ্যতার একান্ত অভাব। শিক্ষকদের উচিত ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশা। আমার ইচ্ছা করে এ দিক দিয়ে অন্তত একটা স্কুলেও একটু আদর্শ স্থাপন করি। সেজন্যই তোমার হস্টেলের চাকরিটা চাই।

সেক্রেটারি বলেন, ভাল। আমি হেডমাস্টারকে চিঠি দিচ্ছি।

—কিন্তু আমার পরিচয়টা একটু গোপন রেখো। সহকর্মীরা যাতে সব সময় সমগোত্রীয় মনে করে। স্কুলে কি বিষয় আমায় পড়াতে হবে ?

—যে বিষয়েই হোক, তোমার তো আর আটকাবে না

—আচ্ছা, পরশু থেকে আশা করি আমি তোমার হস্টেলের ভার নিতে পারবো।

সেক্রেটারি নিশ্চিন্ত হন। বন্ধুও খুশী হন মনোমত কাজ পেয়ে।

ছাত্রাবাসে শক্তির কাছে অজয় সগর্বে বলে, দেখলে তো তোমাদের রামগরুড়কে শেষ পর্যন্ত তাড়ালাম।

শক্তি বলে, কিন্তু এ রকম কাজে শেষ পর্যন্ত কোন লাভ হবে না। একজন গেল, তার জায়গায় আর একজন আসবে।

—তাকেও তাড়াবো। যে আসবে তাকেই তাড়াবো।

অজয়ের কথা শুনে মৃদু হেসে শক্তি বলে, তা হয় না। পাঁচদিন দুষ্টুমি করলে একদিন তুমি ঠিক ধরা পড়বে। তখন তোমায় হস্টেল থেকে তাড়াবে।

শক্তির কথাটা যে সত্য সেটা অজয় বোঝে। তবু বলে, হস্টেল থেকে তাড়নোকে আমি ভয় করি না। এখান থেকে তাড়ায়, অন্য জায়গায় যাবো। কিন্তু তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবে এই যা দুঃখ।

শক্তি অজয়কে অনুরোধ করে, আর কোন দুষ্টুমি করো না, অজয়।

অজয় একটু নীরব থেকে বলে, আচ্ছা, তোমার কোন ফটো আছে ?

শক্তি ঘাড় নাড়ে। জিজ্ঞাসা করে, কেন ?

—এমনি বলছিলাম। আচ্ছা, চলো না আজ বিকেলে গিয়ে আমরা ফটো তোলাই

বেশ তো ! শক্তি বলে।

ভবিষ্যতে যদি বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় সেই ভয়ে একটা স্মৃতি-চিহ্ন সংগ্রহ করে রাখার ইচ্ছা অজয়ের মনে জাগে।

বিকেলে অজয় ও শক্তি যখন ফটো তুলিয়ে ফিরছিল, তখন এক রাস্তার মোড়ে শিশিরের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়। শিশির সোজা স্টেশন থেকে আসছে। এদের দেখে তার ছাত্র বলে মনে হলো। তাই জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা খোকা, ব্রজনাথ হাই স্কুলটা কোন্ দিকে ?

অজয় তাড়াতাড়ি বলে, বাঁ দিকের রাস্তা ধরে সোজা চলে যান।

শক্তি বলতে যায়, না—

কিন্তু অজয় তাকে তাড়াতাড়ি বাধা দেয়।

শিশির অজয়ের কথা শুনে এগুতে যাচ্ছিল, কিন্তু শক্তির কথাটা অস্পষ্ট ভাবে কানে আসায় ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, অ্যাঁ ?

অজয় বলে, কিছু না। আপনি সিধে নাকের ডগা বরাবর গিয়ে যান।

—অনেকটা যেতে হবে ?

—না, এই মাইল খানেক গেলেই দেখবেন বড় বাড়ি, বড় বড় অক্ষরে লেখা।

শিশির অজয়ের কথা শুনে একটু অবাক হয়ে বলে, স্টেশনে জিজ্ঞাসা করায় একজন বল্লে কাছেই। তাই আর গাড়ি নিলাম না। যাক্ গে—আচ্ছা।

অজয়ের নির্দেশিত পথেই সে চলে। সঙ্গে একটা স্যুটকেস ও ছোট বিছানা থাকায় এবং হস্টেলটা স্টেশনের খুব কাছেই শুনে সে আর কুলি করেনি। এখন দূরত্ব শুনে একটু ঘাবড়ে যায়।

সে শ্রুতি-পথের বাইরে যেতে শক্তি অজয়কে বলে, লোকটাকে ভুল পথ বল্লে কেন?

—একটু ঘুরুক। আমাদের খোকা বল্লে কেন?

—ও যদি আমাদের নতুন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়?

—হ্যাঁ, তুইও যেমন। ও সুপারেণ্টেণ্ডেণ্ট হবে কি? কত অল্পবয়স, আর কি রকম 'ক্যাবলা ক্যাবলা' দেখতে!

শক্তি অজয়ের কথার উত্তরে বলে, হলে কিন্তু বেশ হতো। দেখে বেশ ভাল লোক মনে হয়।

শিশিরের সৌম্য শান্ত মূর্তিটি শক্তির ভালো লেগেছিল।

এদিকে শিশির অজয়ের নির্দেশিত পথে বেশ খানিক দূর হাঁটার পর একবারে লোকালয়ের বাইরে গিয়ে পৌছায়। শেষে অনেক ঘুরে বহু লোককে জিজ্ঞাসা করে স্কুলে উপস্থিত হ[illegible]।

স্কুলের কাছেই হেডমাস্টার মশায়ের বাড়ি তিনি শিশিরকে অসময়ে দেখে অবাক হন। জিজ্ঞাসা করেন ট্রেন কি খুব লেট ছিল ?

শিশির বলে, না। পথ ভুল করে একটু ঘুরলাম।

—চলুন, চলুন। আগে আপনাকে হস্টেলে নিয়ে যাই।

হস্টেলে ছেলেদের ডেকে হেডমাস্টার মশাই শিশিরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। বলেন, ইনি তোমাদের নতুন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, আর এরাই আপনার ছাত্র।

শিশির ছেলেদের মুখগুলির উপর চোখ বুলায়। অজয় ও শক্তির উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। অজয়ের মুখ শুকোয়, শক্তি চোখ নামায়।

শিশির অল্প হেসে বলে, এদের মধ্যে দুজনের সঙ্গে আলাপ আমার আগেই হয়েছে। রাস্তায় তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, এর মধ্যে ভুলে গেলে ?

অজয় ও শক্তি নির্বাক থাকে। হেডমাস্টার মশাই বলেন, সে কি! ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, অথচ আপনি পথ ভুল করে অনর্থক ঘুরেছেন!

—হ্যাঁ। পথ ভুল হয়েছিল, কিন্তু এদের চিনতে ভুল হয়নি। কি নাম তোমার ?

শক্তি নাম বলে।

—আর তোমার ?

—অজয় মুখোপাধ্যায়।

—তোমার সঙ্গে পরে ভাল করে আলাপ করবো, অজয়। কেমন ?

হেডমাস্টার মশাই বলেন, আসুন, আপনার ঘরটা দেখিয়ে দিই।

হেডমাস্টার ও শিশির সরে যেতেই ছেলেরা সব অজয়কে ঘিরে ধরে ব্যাপার কি জানার জন্য। অজয় পথের ঘটনা তাদের শোনায়।

শৈলেন মন্তব্য করে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। লোকটা সত্যি করে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়ে গেল।

কিছু পরে শিশির যখন অজয়কে তার ঘরে ডেকে পাঠায়, তখন অমূল্য রবি প্রভৃতি এসে দরজার বাইরে আড়ি পাতে।

নির্মল বলে, অজয়কে এক চোট নেবে !

অমূল্য মুচকে হেসে বলে, হুঁ, হুঁ, বাবা ! ভুল পথ বলার মজা দেখাবে।

ঘরের মধ্যে শিশির অজয়কে প্রশ্ন করে, আচ্ছা অজয়, তুমি আমায় ভুল পথ বল্লে কেন ?

অজয় নিরুত্তর থাকে।

—বলো, কেন বললে ?

অজয় জবাব খুঁজে পায়, আমি ভুল বলিনি, আপনি বুঝতে ভুল করেছেন !

—কি রকম ?

বাঁ দিক বলে আমার বাঁ দিক বোঝাতে চেয়েছিলাম, আপনি আপনার বাঁ দিক ধরে চলে গেলেন।

অজয়ের দুষ্টু বুদ্ধি দেখে শিশির হেসে ফেলে। বলে, দেখ, দুষ্টুমি তো করেছ, তার জন্যে তো আমি তোমায় কিছু বলছি না বা মারছি না। তবে শুধু শুধু মিথ্যে কথা বলছ কেন? মিথ্যে কথা বলা বুঝি তোমার অভ্যাস?

—না।

—তবে বলছ কেন? বলো! কোন ভয় নেই। শিশির তাকে অভয় দেয়।

অজয় আস্তে আস্তে বলে, ভয়ে বলছিলাম।

শিশির উচ্চ কণ্ঠে হেসে ওঠে। বলে, এতো ভীতু তুমি!

অজয় লজ্জায় চোখ নামায়।

তোমার দুষ্টুমি দেখে আমি ভেবেছিলাম খুব সাহসী ছেলে তুমি। এখন দেখছি একেবারে উল্টো। আচ্ছা, সত্যি কি তুমি আমায় ভয় করো? দেখো, চেয়ে দেখো আমার দিকে। বলো!

অজয় চোখ তুলে দেখে শিশিরের চোখে সস্নেহ দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি, দুরন্ত কৌতুকে যেন তার সারা মুখ উজ্জ্বল। এ মানুষকে ভয় করার চেয়ে ভালবাসতে ইচ্ছা হয়। অজয় শিশিরের কথার জবাবে বলে, না।

শিশির প্রশ্ন করে, তাহলে?

আপনাকে ভয় করি না। ভয় করি আপনার মারকে।

মৃদু হেসে অজয়ের কাঁধে এক হাত রেখে শিশির বলে, কিন্তু অন্যায় না করলে আমি মারব কেন? তাহলে ভয়ের কারণ হচ্ছে মার, আর মারের কারণ হচ্ছে অন্যায়। অন্যায় করেই মানুষ ভীতু হয়ে পড়ে। আমি চাই না আমার কোন ছেলে ভীতু হয়। কাজেই কখনো অন্যায় করো না। কেমন? তাছাড়া অন্যায় করলে অপরের যত ক্ষতি না হয় নিজের ক্ষতি হয় তার চেয়ে ঢের বেশী। একথাটা অবশ্য তুমি পরে বুঝতে পারবে। আচ্ছা, এখন তুমি এস অজয়।

শিশির ঘর হতে বারান্দায় বের হতেই অন্যান্য ছেলেরা অজয়কে ঘিরে ধরে।

রবি বলে, এতক্ষণ ধরে কি বল্লে রে?

অজয় বলে, ঘোড়ার ডিমের যত বাজে কথা, খালি লেকচার। অন্যায়—ক্ষতি—ভীরুতা—এই সব।

অমূল্য একটু হতাশ হয়েই বলে, তাহলে ধমকাল না, মারল না?

—না। বল্লে আমি মারতে চাই না, আমি চাই না ছেলেরা ভীতু হোক।

অমূল্যর আশা পূর্ণ না হওয়ায় সে চলে যায়। রবি চুপি চুপি অজয়কে বলে, ওঃ, মস্ত সাহসী এসেছেন। সাহস বের করে [illegible]।

অজয় হেসে বলে, আচ্ছা, আজ রাত্রেই।

শিশিরের মধ্য রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হয় মুখমণ্ডলের উপর শীতল জলধারার স্পর্শে। তাড়াতাড়ি সে বিছানার উপর উঠে বসে। খাট হতে নামতে গিয়ে সে দেখে মেঝের উপর একটি আগুনের শিখা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হবার আগেই তার কানে আসে এক করুণ আর্তনাদ। আর্তনাদ ক্রমেই তার জানালার দিকে এগিয়ে আসে এবং সেই সঙ্গে আসে এক প্রেতমূর্তি। শিশির ভয় পেলেও উপস্থিত বুদ্ধি হারায় না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে মূর্তিটিকে লক্ষ্য করে। তার মনে হয় প্রেতের সকরুণ বিলাপ যা তার কানে আসছে সেটা যেন ঠিক প্রেতের মুখ হতে নির্গত হচ্ছে না, বুকের কাছ হতে শব্দটি আসছে এবং স্বরধ্বনিরও তারতম্য আছে। আঁ, আঁ, আর্তনাদ যেন দুটি কণ্ঠ হতে উচ্চারিত হচ্ছে। চকিতের জন্য শিশিরের মনে জাগে ব্যাপারটা বোধ হয় কোন দুষ্টু লোকের বদমাইশি। সে তাই সাহস করে জিজ্ঞাসা করে, কে ?

আর্তনাদ বন্ধ হয়। শিশিরের সাহস বেড়ে যায়। সে বলে, দাঁড়াও।

শিশিরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে প্রেতের দেহের মধ্যে যেন এক আলোড়ন শুরু হয়। চাদরে আবৃত দেহের নিম্নভাগ যেন দুই অংশে বিভক্ত হয়ে যায়, শিশির লাফিয়ে জানালার কাছে যায়, মূর্তিটিও নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হয়।

এক চাদরে সর্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে অজয় ও রবি দুজনে এসেছিল ভূত সেজে। শ্মশান হতে তারা লুকিয়ে কুড়িয়ে এনেছিল এক মড়ার মাথার হাড়। সেটি এক লাঠির ডগায় বিঁধে লাঠিটিতে কাপড় জড়িয়ে তারা এক ভয়ংকর দীর্ঘ প্রেতমূর্তি তৈয়ারি করেছিল এবং দুজনে নাকী সুরে চীৎকার জুড়েছিল। তারা আশা করেছিল নন্দবাবুর মত শিশিরও এতে ভয় পাবে। কিন্তু শিশিরের আচরণ আশানুরূপ না হওয়ায় তারা নিজেরাই ভয়ে পালায়।

শিশির তাড়াতাড়ি ঘরের আলো জ্বালে। মেঝের সচল অগ্নিশিখার রহস্য নিমেষে তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। একটি কচ্ছপের পিঠের উপর একটি মোমবাতি বসানো। অন্ধকারে কচ্ছপটি ঘুরে বেড়ানোর ফলে বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল। কচ্ছপটিকে ঘর হতে বের করে দেওয়ার জন্য শিশির দরজা খুলে বাইরে আসে।

বারান্দায় বের হতেই তার কানে আসে দোতলার বারান্দায় কার দ্রুত পায়ের শব্দ। কে যেন উপরের কোন ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। শিশির সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হয়। তার নজরে পড়ে সিঁড়ির উপর একটি চাদর পড়ে রয়েছে। রবি ও অজয়ের দৌড়ে পালাবার সময় এই চাদরটি তাদের প্রেতরূপী লাঠির অঙ্গ হতে খুলে পড়ে। সিঁড়ির কয়েক ধাপ ওঠার পর তারা টের পায় চাদরটি পড়ে গেছে, কিন্তু তখন ফিরে কুড়িয়ে নেবার আর উপায় ছিল না। কারণ শিশির ঘর হতে তখন

বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে। অগত্যা তারা তাড়াতাড়ি নিজেদের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

শিশির চাদরটি কুড়িয়ে নিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে। তার নজরে পড়ে এক কোণে কালো সুতো দিয়ে চাদরের অধিকারীর নাম লেখা 'রবি'। সমস্ত ব্যাপারটা শিশিরের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

* * * *

পরদিন সকালে শিশির রবিকে তার ঘরে ডেকে পাঠায়। চাদরটি দেখিয়ে বলে, এটা কাল তুমি ফেলে গিয়েছিলে।

রবির মুখ শুকিয়ে যায়। সে শিশিরের দিকে চোখ তুলে চাইতে সাহস করে না।

শিশির মৃদু হেসে বলে, কাল তাহলে তুমিই ভূত সেজেছিলে।

রবি নিরুত্তর থাকে।

শিশির বলে, কিন্তু কেন সেজেছিলে? আমায় ভয় দেখিয়ে মজা দেখার জন্য? আচ্ছা, ধর যদি আমি ভয় পেতাম। তোমাদের যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চলে গেছেন তাঁর চেয়েও অনেক অনেক বেশী ভয় পেতাম। মনে কর আমার হার্ট খুব দুর্বল; তাহলে ভয় পেয়ে মারা যেতাম। তখন কি হতো? তুমি কি আমায় মেরে ফেলতে চেয়েছিলে?

শিশিরের যুক্তির গুরুত্ব রবি বোঝে। সে বলে, না, স্যার।

শিশির আরো বলে, তবে? তবেই দেখো মজা যখন করবে তখন সব সময় মনে রাখবে তাতে অপরের অনিষ্ট হবার আশঙ্কা

আছে কিনা। অপরের যাতে অনিষ্ট হবার আশঙ্কা আছে সে কাজ কখনো করা উচিত নয়, কারণ শেষে অনুতাপে নিজেকেই কষ্ট পেতে হবে। আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ?

—হ্যাঁ, স্যার। শিশিরের কথাগুলি রবি মন দিয়ে শোনে। সত্যি, ভূত সেজে ভয় দেখানোর সময় সে মোটেই ভাবেনি যে ভয় পেয়ে মানুষটি মারা যেতে পারত। তাহলে কিন্তু সত্যি ব্যাপারটা খুবই খারাপ হতো। একজন মানুষকে মিছিমিছি মেরে ফেলতে রবি মোটেই রাজী নয়।

শিশির বলে, ছেলেমানুষ তোমরা, দুষ্টুমি করতে ইচ্ছা করে—এতো খাঁটি কথা। দুষ্টুমিতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু বদমাইশি আমি অপছন্দ করি। আচ্ছা, অপরের যাতে ক্ষতি না হয় এমন একটি দুষ্টুবুদ্ধি বের করো দেখি!

রবি অবাক হয়। আশ্চর্য মানুষ তো এই নতুন স্যার! কাল রাত্রে দুষ্টুমি করার জন্য না মেরে বা ধমকে আরো দুষ্টুমি করার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন। শিশিরের ব্যবহারটা তাকে রীতিমত ভাবিয়ে তোলে।

রবিকে নির্বাক দেখে শিশির বলে, কি, মাথায় আসছে না? খুব মজার, খুব আনন্দের একটা কিছু—

রবি একটু ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞাসা করে, সত্যি বলব, স্যার?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো—বলো—

রবি বলে, মানিক স্যার ঠাণ্ডার ভয়ে তিন চার দিন চান করেনি; ওকে জোর করে চান করিয়ে দেব?

—ওর শরীর খারাপ হয়নি তো ?

—না, স্যার। ঠাণ্ডা জলকে ও ভীষণ ভয় করে।

—তাই নাকি ? তাহলে কজনে মিলে ধরে ওকে চান করিয়ে দাও।

রবি শিশিরের এই অনুমতি দান স্বকর্ণে শুনেও যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। জিজ্ঞাসা করে, সত্যি দেব, স্যার ?

—নিশ্চয়ই। পরিচ্ছন্নতার জন্য স্নানের প্রয়োজন।

রবি আনন্দে লাফিয়ে ঘর থেকে বের হতে যায়। শিশির তাকে ডেকে বলে, চাদরটা ফেলে যাচ্ছ।

রবি হেসে চাদরটা তুলে নেয়। শিশিরকে তার খুব ভাল লাগে।

রবির মুখ হতে শিশিরের আদেশ শুনে ছেলেদের আনন্দের বাঁধ ভেঙে যায়। সেদিন স্নানের সময় জন কয়েক মিলে মানিককে চ্যাংদোলা করে নিয়ে আসে পুকুরের কাছে। মানিক তাদের সকাতর অনুরোধ করে, ছেড়ে দে, ভাই! ছেড়ে দে !

কেউ তার কথায় কান দেয় না। সে হাত পা ছোঁড়ে। অন্যান্য ছেলেরা তাকে সহজে ছাড়ে না। রবি কুলিদের সর্দারের মতন সঙ্গীদের উৎসাহ দেয় মানিককে বহন করার কাজে।

রবি বলে, সাবাস জোয়ান !

ছেলেরা সমস্বরে বলে, হেঁইয়ো !

—আউর থোড়া !

—হেঁইয়ো !

—উপর তোলো !

—হেঁইয়ো !

—এবার ফেলো !

হেঁইয়ো ! রবির নির্দেশ মত সকলে মানিককে জলে ফেলে। তারপর নিজেরাও ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ভাল ভাবে চুবানোর জন্য। ছেলেদের সেদিনের স্নানের আনন্দ অবর্ণনীয়।

শিশির দূর হতে ছেলেদের কাণ্ড দেখে হাসে। ভাবে ছেলেদের যত দুষ্টুমি এইভাবে ধীরে ধীরে সৎকাজের দিকে নিয়ে যেতে হবে।

খাবার ঘরে পরিবেশনের আগে ছেলেরা জড় হয়ে গণ্ডগোল হৈ হৈ করে।

অমূল্য হাঁক দেয়, ঠাকুর ! তাড়াতাড়ি আনো—

ঠাকুর ভাতের হাঁড়ি হাতে এগিয়ে এসে বলে, বসুন ! পর পর দিউচি।

ঠাকুরকে রাগাবার জন্য শৈলেন বলে, Quick—Quick ! Honolulu কোথাকার।

—কড় কইলা ? মুতে বিলাতী গালি দিলা ?

শৈলেন আরও গম্ভীর ভাবে ধমক দেয়, Shut up Philippines !

ভৌগোলিক নামগুলি ঠাকুরের গালি বলেই বিশ্বাস হয়।

এমন সময় শিশির এসে খাবার ঘরে উপস্থিত হয়। ছেলেদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সব স্বচক্ষে দেখার তার ইচ্ছা। সে আসতেই ঠাকুর তার কাছে নালিশ জানায় যে শৈলেন বাবু তাকে ইংরাজীতে গাল দিয়েছে। শিশির গম্ভীর ভাবে জানতে চায় কী বলেছে?

—লুলুলুলু!

—কি? শব্দটা শিশিরের বোধগম্য হয় না। ছেলেরা কিন্তু ঠাকুরের কথায় উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে।

শৈলেন শিশিরকে বলে, আমি ওকে গাল দিইনি স্যার। বলেছি হনলুলু, ফিলিপিন্‌স্।

শিশির ব্যাপারটা বোঝে। বলে, ও! আচ্ছা, ওটা আর বলো না। এবার থেকে বলবে হোক্কাইডো—হোয়ানসিও—কিওসিও—সিওকিও।

ছেলেরা সমবেত কণ্ঠে জাপানী দ্বীপপুঞ্জের নামগুলি আওড়ায়। তারা চেঁচায়, হোক্কাইডো—হোয়ানসিও—কিওসিও—সিওকিও!

—Good, very good! হাতের ইঙ্গিতে ছেলেদের চেঁচাতে নিষেধ করে শিশির বলে, এইভাবে শক্ত শক্ত নামগুলি ধরে ডাকলে মুখস্থ হয়ে যাবে। শৈলেন, তুমি বেশ ভাল বুদ্ধি বের করেছ। আমাকেও একটা অদ্ভুত নাম দিয়ে দিও।

শিশির যে তাদের এতটা স্বাধীনতা দেবে ছেলেরা আশা

করতে পারেনি। একজন বলে, আপনি রাগ করবেন না, স্যার?

শিশির একটু হেসে বলে, রাগ করবো কেন? What's in a name! গোলাপকে যে নামেই ডাক গন্ধ তার সমানই থাকে।

রবি জানায়, আগের স্যারকে আমরা রামগরুড় বলতাম। শুনলে তিনি ভীষণ রেগে যেতেন, অনেককে মেরেছেন।

রামগরুড়ের কথা মনে পড়তেই ছেলেদের হাসি পায়। অজয় জিজ্ঞাসা করে, ঐ রকম একটা আপনার নাম দিলে মারবেন না?

—আরে, আড়ালে তো লোকে রাজার মাকেও ডাইনী বলে। পিছনে তোমরা আমাকে নিশ্চয়ই গাল দাও, তখন সেটা সামনে দিলেই বা রাগ করব কেন?

নির্মল বলে, আপনাকে আমরা গাল দিই না, স্যার।

রবি বলে, আপনাকে আমাদের খুব ভাল লাগে।

তাই নাকি? Good! শিশির বোঝে ছেলেদের মন সে জয় করেছে, এবার সে সহজেই তাদের প্রভাবান্বিত করতে পারবে। কৃত্রিম দুঃখভরে সে বলে, তাহলে আমার আর নামকরণ অর্থাৎ বদনাম হলো না।

ছেলেদের পাশেই এক বেঞ্চে শিশির আসন গ্রহণ করে ঠাকুরকে বলে, ঠাকুর। কই আমার ভাতটাও এনে দাও।

ছেলেরা অবাক হয়। অমূল্য বলে, সেকি! আপনি আমাদের সঙ্গে খাবেন, স্যার?

অতো অবাক হচ্ছো কেন? খেলে তোমাদের জাত যাবে?

অমূল্য বলে, না, স্যার। এর আগে কোন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খাননি।

শিশির রহস্যভরে বলে, তাহলে আমি ফার্স্ট হলাম। কি প্রাইজ তোমরা আমায় দেবে? বলো!

ছেলেরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। শিশিরের কথা তারা ঠিক বুঝতে পারে না।

শিশির বলে, কী, সব চুপ করে রইলে যে? কী দেবে ভেবে পাচ্ছ না? You offer yourselves—নিজেদের দান করো। আমি তোমাদের চাই। তোমাদের নিয়ে নতুন জগৎ গড়ব। 'স্বাস্থ্যে-শৌর্যে প্রাণ-প্রাচুর্যে ভাতিবে দীপ্ত নব মানব।'

শিশিরের শেষ কথাটি শুনে রূপ বোঝে না কোন কবিতার পঙ্‌ক্তি! সে বোকার মত জিজ্ঞাসা করে, কবিতা, স্যার?

—হ্যাঁ। তোমরা কেউ আবৃত্তি-অভিনয় এসব করো না? ও! আচ্ছা, এবার ছুটির আগে তোমাদের নিয়ে একটা অভিনয় করব।

ছেলেরা খুব খুশী হয়। ইতিমধ্যে ঠাকুর শিশিরের ভাত ও ব্যঞ্জনাদি নিয়ে আসে। শিশির নিজের পাতের নানা উপকরণগুলি দেখে এবং এও দেখে যে ছেলেদের পাতে সেগুলি দেওয়া হয়নি। শিশির প্রশ্ন করে, ঠাকুর, আমার এতো সব! ছেলেদের কই?

অমূল্য বলে, আপনার জন্য স্যার স্পেশ্যাল রান্না হয়।

তাই নাকি! নিয়ে যাও এসব তুলে। ঠাকুরকে বাটিগুলি দেখিয়ে শিশির বলে। নতুন শিক্ষকের আচরণে ঠাকুর রীতিমত

অবাক হয়, হস্টেলের আবহমান কালের নিয়ম তিনি ভাঙছেন। ঠাকুর ইতস্তত করে। কিন্তু শিশির গম্ভীর ভাবে যখন দ্বিতীয়বার আদেশ দেয় তখন সে তাড়াতাড়ি বাটিগুলি তুলে নেয়।

গমনোদ্যত ঠাকুরকে শিশির নির্দেশ দেয়, কাল থেকে সকলের জন্য স্পেশ্যাল রান্না হবে।

শিশিরের আচার-ব্যবহারে ছেলেরা সাহস পেয়ে তাদের এতদিনের অভিযোগ অকপটে পেশ করে। বলে, ঠাকুর বড় বিশ্রী রান্না করে। ভীষণ ঝাল, মুখে তোলা যায় না। মাছ একটার বেশী চাইলে পাওয়া যায় না।

ছেলেদের কথা শুনে শিশির বলে, ঠাকুর, কাল থেকে ছেলেদের রান্না খারাপ হলে তোমাকে দেশে পাঠাবার স্পেশ্যাল ব্যবস্থা হবে।

রবি সানন্দে বলে, ঠিক কথা, স্যার।

অসীম বলে, খুব ভাল কথা, স্যার।

শিশির ছেলেদের দিকে চেয়ে বলে, কিন্তু ভাল রান্নার জন্য ভাল তরিতরকারি নিজেদের দেখে কেনা চাই। চাকরের উপর সব ভার দিলে চলে না।

নির্মল বলে, আমরা স্যার বাজার করবো।

—বেশ তো! পালা করে রোজ একজন যাবে।

রবি বলে, কাল স্যার আমি যাব।

অসীম রবির কথায় আপত্তি জানিয়ে বলে, না স্যার, ও পয়সা চুরি করবে।

রবি মুখ ভেংচে বলে, আহাহা ! 'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ'।

অসীম তাকে বক দেখায়।

শিশির দুজনকেই থামতে ইঙ্গিত করে বলে, আচ্ছা, আচ্ছা, ঝগড়া করো না। রবি চুরি করবে ? কত চুরি করবে ? জিনিসপত্রের দাম তো মোটামুটি সকলেই জানে ; এক পয়সা দু-পয়সা করে বড় জোর ও দু-আনা পর্যন্ত চুরি করতে পারে। কেমন ? আমি ওকে চার আনা চুরি করার সুযোগ দিলাম।

শিশিরের কথায় ছেলেরা অবাক হয়। বলে, সে কি, স্যার।

শিশির বোঝায়, হ্যাঁ, যে বাজার যাবে সেই চার আনা পাবে। তবে চুরি করে নয়, পারিশ্রমিক হিসাবে। জিনিসপত্রের দরদস্তুর করে কিনবে, ঠিক হিসাব দেবে, তার বদলে চার আনা করে পাবে খাটুনির দাম। কিন্তু একটা কথা, পয়সা পেয়ে বাজে খরচ করবে না।

রবি বলে, না স্যার। বাজার করে যে পয়সা পাবো তারও খরচের হিসাব আপনাকে দেবো।

বেশ, বেশ। শিশির খুশী হয়, বলে আরো শোনো—হস্টেলের বাজারের জন্য যত পয়সা মাসে বরাদ্দ করা আছে তোমাদের বাজার করার ফলে যদি তার কিছু বাঁচে তো মাসের শেষে ফিস্ট হবে। মাছ মাংস পোলাও মিষ্টি, যা হয়—কেমন ?

ছেলেরা সানন্দে সমর্থন করে, খুব ভাল হবে, স্যার।

রূপ বলে, স্যার, আপনি কেন আরও আগে আসেননি, স্যার ?

রূপের কথায় শিশিরের সঙ্গে ছেলেরাও উচ্চ কণ্ঠে হেসে ওঠে।

বিকালে শক্তি একা বাগানে তার দোলনায় বসে বই পড়ছিল, এমন সময়ে পিছন থেকে অজয় এসে তার চোখ টিপে ধরে। শক্তি প্রথমে একটু চমকে উঠলেও বোঝে অজয়।

অজয় তাকে প্রশ্ন করে, তোর জন্য কি এনেছি বল্ দেখি ?

—চিনে বাদাম ?

—না।

—নতুন গল্পের বই ?

—দূর !

—তবে কিরে ?

—ছবি রে ছবি। আমরা সেই যে ফটো তুলেছিলাম।

সাগ্রহে শক্তি বলে, কই দেখি !

অজয় ছবি দুটি শক্তির হাতে দেয়। শক্তির নিজের ছবিটা একবার দেখে, 'ক্র্যাচে' ভর দেওয়া নিজের পঙ্গুমূর্তি দেখে তার মন খারাপ হয়ে যায়। সে যে খোঁড়া এই বোধটি তার মনের গোপন কোণে লজ্জা দুঃখ ও দুর্বলতা সৃষ্টি করে রেখেছে। সেজন্য সে সব সময় অন্য ছেলেদের সংসর্গ একটু এড়িয়ে চলে হৃদয়ের এই

দুর্বল কোণে আঘাত পাবার ভয়ে। তার একাকীত্ব দূর করার সঙ্গী শুধু বই, তার মা, আর সম্প্রতি অজয় হয়েছে। অবশ্য সে যে পঙ্গু একথা তার সব সময় স্মরণ থাকে না; স্মরণ থাকে না এইজন্য যে মানুষের মন চিরচঞ্চল। শক্তিরও মনে হয় সে আর সকলকার মতই। কিন্তু এবার হতে ঐ ছবিই তাকে সব সময় মনে করিয়ে দেবে যে সে পঙ্গু। নিজেকে তার ভীষণ কুৎসিত বলে মনে হয়।

শক্তি বলে, কী বিশ্রী দেখতে রে আমায়।

অজয় ভাবে সুন্দর শক্তির চেহারা ছবিতে খারাপ উঠেছে। তাই সে প্রতিবাদ করে বলে, যাঃ, বেশ তো উঠেছে। একবারে হুবহু।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শক্তি বলে, সেইজন্যই তো বিশ্রী। ফটো তোলার সময় বল্লাম না, আমায় দেখতে খারাপ, খারাপ ফটো উঠবে। দে, ছিঁড়ে ফেলি—

শক্তি ফটোটা ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত হয়, অজয় তাড়াতাড়ি তার হাত হতে কেড়ে নিয়ে বলে, না, না, ছিঁড়ে ফেলবি কি?

—ও ফটো রাখে না।

—তুই না রাখিস আমি রাখব।

—কি হবে রেখে?

—এমনি।

—তাহলে তোর ফটোটা আমায় দে।

অজয় নিজের ফটোটা শক্তির হাতে দিয়ে বলে, তা রাখ্। কে জানে কবে আমায় হস্টেল থেকে তাড়াবে তখন ওটা দেখে মাঝে মাঝে আমার কথা মনে পড়বে।

শক্তি বলে, তুই যদি চাস যে তোকে হস্টেল থেকে তাড়ানো হোক, তাহলে আর কে তোকে রাখতে পারে বল্? নতুন স্যার সবাইকে ভালবাসেন, তাঁর কথা সকলে শোনে; কিন্তু তুই মোটে শুনবি না, মোটে পড়বি না।

অজয় বলে, নতুন স্যার একটা অদ্ভুত লোক।

শক্তি বলে, আমাদের মত ভূতের জন্য ঐ রকম একটা অদ্ভুত লোক দরকার।

শিশিরকে অজয়ের মনে মনে খুব ভাল লাগলেও শক্তির কাছে সে তা স্বীকার করে না। বরাবর বয়স্ক লোকদের কাছ হতে শাস্তি পেয়ে তাদের সম্বন্ধে স্বাভাবিকভাবে তার মনে এক বিরূপ ধারণা জন্মে গেছে। তাই সে বলে, রাখ্, রাখ্। নতুন নতুন সবাই ভাল মানুষ থাকে, তারপর দুদিন বাদেই ফোঁস করে আসল মূর্তি বের হবে।

শক্তি বোঝে অজয়ের কথার প্রতিবাদ করে লাভ নেই; আপনা হতে মনে কারও সম্বন্ধে শ্রদ্ধা না জাগলে জোর করে জাগান যায় না।

পরদিন স্কুলের ব্ল্যাকবোর্ডে অজয় এক ভূতুড়ে ছবি আঁকা শুরু করে দেয়। সবে ক্লাস্ বসার ঘণ্টা বেজেছে, শিক্ষক আসতে

মিনিট খানেক দেরি হবে ভেবে অজয় পুরোদমে তার শিল্প চর্চা চালায়। ছেলেরাও তাকে উৎসাহ দেয় আঁকতে।

—এই অজয়! ভাল করে গোঁফ এঁকে দে।

—টিকি করে দে। লম্বা টিকি।

—টিকিতে ফুল এঁকে দে।

অজয় ছবির তলায় লেখে। অদ্ভুত—নতুন স্যার্‌র্‌।

ছেলেরা হো হো করে হাসে। এখন শিশিরেরই ক্লাস বটে।

হঠাৎ রবি অজয়কে সতর্ক করে দেয়, এই, স্যার আসছেন।

অজয় তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় এসে বসে।

শিশির ঢুকেই বোর্ডের উপর ঐ অপকীর্তি দেখে। বোঝে তার অবাধ স্বাধীনতা দানের ফলে ছেলেরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছে। তা এমনি হওয়াই স্বাভাবিক; ধৈর্য ধরে তাদের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। শাসন করা মানে এক কচি কিশলয়কে দলে পিষে নষ্ট করা। কে জানে, ভবিষ্যতে ঐ ছেলেই হয়তো শিল্পী নন্দলাল বসু বা কার্টুনিস্ট শৈল চক্রবর্তী হবে। অঙ্কুরকে নষ্ট করা উচিত নয়। মৃদু হেসে তাই সে বলে, ওটা কি আমি নাকি? আরে, আমি কি দেখতে অতো খারাপ? কী বলো তোমরা?

ছেলেরা সমস্বরে বলে, না, স্যার।

নির্মল বলে, ওটা স্যার আপনার ব্যঙ্গ চিত্র।

—ব্যঙ্গ চিত্র ? কিন্তু আমার চারচোখ কই ? [illegible] চশমা। ছবিটা এই রকম হওয়া উচিত ছিল, বলে সে ছবিটাকে আরও অদ্ভুত করে তোলে।

ছেলেরা অবাক হয়ে দেখে। গোবিন্দ বলে, বাঃ! স্যার তো বেশ আঁকতে পারেন।

ছবি আঁকা শেষ করে ছেলেদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে শিশির প্রশ্ন করে, আচ্ছা, এটা কে এঁকেছিল ?

অমূল্য তার চিরকালের অভ্যাস মত উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমি জানি স্যার। বলব ?

শিশির গম্ভীর ভাবে বলে, না। যে এঁকেছে সে নিজে বলবে। আমার ছেলেদের মধ্যে এটুকু সৎসাহস নিশ্চয় আছে।

অজয় আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমি এঁকেছি স্যার।

—Good, very good my boy! শিশির অজয়ের কাছে গিয়ে পিঠ চাপড়ে বলে, এই তো আমি চাই। আমি খুব খুশী হয়েছি তোমার সত্য কথায়। সত্যকে চিরদিন আঁকড়ে থেকো, তার জন্য যত লাঞ্ছনা, কষ্ট পাবারই ভয় থাক না কেন।.... আচ্ছা, কই দেখি কি আজ তোমাদের পড়া আছে।

শিশির পড়ানো শুরু করে। সমস্ত ছেলে তার প্রতি এক সুগভীর শ্রদ্ধা নিয়ে মন দিয়ে তার কথা শোনে। শিশিরের ব্যবহারে ও আন্তরিক দরদ মেশানো কথায় অজয় মুগ্ধ হয়। লোকটার কিছুতেই কারুর উপর রাগ হয় না বলে মনে হয়।

[illegible] পূর্বের অনুমান মিথ্যা, লোকটি সত্যিই ভাল মানুষ, ভালমানুষি তার চাল নয়।

কিন্তু শিশিরের ভালমানুষি তার সহকর্মীরা সহ্য করতে পারেন না। আজ সেইজন্য টীচার্স রুমে তাঁদের আলোচনার বস্তু হয় শিশিরের আচরণ।

নাকে নস্যি গুঁজে পণ্ডিতমশাই শিশিরকে বলেন, শুনলাম অজয় আজ বোর্ডে আপনার একটা ছবি এঁকেছিল।

রাশভারী শিক্ষক ব্রজেনবাবু বলেন, বেত মেরে ছেলেটার পিঠের ছাল তুলে দিলেন না কেন?

কি লাভ হতো তাতে? শিশির জিজ্ঞাসা করে।

অমলবাবু শিশিরের কথায় একটু অবাক হয়ে বলেন, কী লাভ হতো! ভবিষ্যতে আর কোনদিন করতে সাহস করতো না।

বৃদ্ধ বিনয়বাবু বলেন, আজ ছবি এঁকেছে, কাল ছড়া কাটবে।

ব্রজেনবাবু বলেন, মার না দিলে ছেলেরা টিট হয় না। Spare the rod and spoil the child কথাটি ঠিক।

তরুণ শিক্ষক ভবেনবাবু ব্রজেনবাবুর কথাটার প্রতিবাদ করে বলেন, তা হলে তো মোষের গাড়ির গাড়োয়ানরাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বলে বিবেচিত হবে। আপনি কি বলেন শিশিরবাবু?

শিশির তার মত ব্যক্ত করে, আমার মতে ছেলেদের পালন করার যেমন প্রয়োজন, শাসন করারও তেমন প্রয়োজন আছে।

তবে দৈহিক শাস্তিদানের বিপক্ষে আমি। [illegible] মানসিক ব্যাধি, সেজন্য মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন। ছেলেদের দুষ্টু মনটাকেই আমি শাসন করতে চাই, এমন ব্যবহার তাদের সঙ্গে করা উচিত যাতে তারা দুষ্টুমি করবে না।

শান্তিবাবু শিশিরের কথায় কোন গুরুত্ব আরোপ না করে পার্শ্বে উপবিষ্ট অমলবাবুকে গোপনে বলেন, লোকটা পাগল। কি রকম বাজে বকছে শুনুন!

মোটকথা শিশিরের ছাত্রদের সঙ্গে আচার-ব্যবহারের ধারা তার সহকর্মীরা সমর্থন করতে পারেন না। কুকুরকে নাই দিলে মাথায় ওঠে, তাঁদের এই ধারণা।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বের হতে হেডমাস্টার সমরবাবু একদিন সব শিক্ষককে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠান। তিনি একটু রাগতভাবেই বলেন, দেখেছেন তো পরীক্ষার ফল? আমাদের স্কুল হতে প্রেরিত ষাটটি ছেলের দুটি ফার্স্ট ডিভিসন, আঠারটি সেকেণ্ড আর থার্ড ডিভিসন, বাকী চল্লিশটি ছেলে ফেল্। এই আপনারা পড়ান? কী আপনাদের বলার আছে বলুন!

ভবেনবাবু বলেন, আমরা তো প্রাণপাত করে চেষ্টা করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গেজেটটা হাতে তুলে সমরবাবু বলেন, হ্যাঁ, এই তার নমুনা। কোন বছর ফল ভাল হয়েছে বলতে পারেন? স্কুল কমিটির কাছে আমি কি জবাব দেবো? এর পরে আর কেউ স্কুলে ছেলে দিতে চাইবে?

শিক্ষকরা কেউ এ কথার জবাব দিতে পারেন না। পণ্ডিত-মশাই ফল খারাপ হবার কারণ হিসাবে বলেন, কিন্তু আজকাল-কার ছাত্ররা কিরকম হয়েছে দেখেছেন তো? পড়ায় মন কই যে ফল ভাল হবে। কেউ ক্লাসে বিড়াল ডাকবে, কেউ কুকুর ডাকবে।

সমরবাবু একথা শুনে আরও রেগে বলেন, আচ্ছা করে শাস্তি দিতে পারেন না।

—বলেন কী! প্রহার? যা ছেলে আজকালকার, তারপর বাড়ি ফেরার সময় পথে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করুক। বৃদ্ধ পণ্ডিতমশাই একটু ভীত ভাবেই জবাব দেন।

সমরবাবু গম্ভীরভাবে বলেন, এবার থেকে দুষ্টু ছেলেদের নাম আমার কাছে পাঠাবেন, আমি স্কুল থেকে তাদের দূর করে দেবো।

শিশির এতক্ষণ সব কথা শুনছিল। নবাগত বলে এই আলোচনায় যোগ দিতে দ্বিধা করছিল। কিন্তু এবার আস্তে আস্তে বলে, তা হলে তো প্রায় সব ছেলেরই নাম পাঠাতে হয়। ছেলে মাত্রই দুষ্টুমি করে থাকে, কারণ সেটা তাদের স্বভাব।

সমরবাবু বলেন, তাদের সেই স্বভাব শোধরাতে হবে।

শিশির মৃদু হেসে বলে, আমিও তো তাই চাই। এখানেই প্রশ্ন আসে শিক্ষার। শিক্ষার গুণেই ছেলেরা ভাল বা খারাপ হয়। ছেলেদের পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ার জন্য দায়ী প্রকৃত-পক্ষে আমরাই।

সমস্ত শিক্ষকের হয়ে যত দোষ ঘাড়ে নেওয়ায় পণ্ডিতমশাই একটু অসন্তুষ্ট হয়ে প্রশ্ন করেন, কি রকম ?

শিশির বলে, ছেলেরা কেন পড়াশোনা করে না তার খোঁজ করেছেন কি কেউ ? ছেলেরা পড়তে চায় না তার কারণ পাঠ্যবস্তু তাদের কাছে অত্যন্ত নীরস লাগে বলে। ছেলেরা খেলতে চায়, দুষ্টুমি করতে চায়, কারণ সেগুলি তাদের ভাল লাগে। যদি এমন ব্যবস্থা করা যায় যাতে ছেলেরা খেলার মত পড়াটাকে ভালবাসবে, সাগ্রহে জানতে চাইবে, শিখতে চাইবে, তখন নিশ্চয়ই ফল ভাল হবে এবং তাদের প্রকৃত সুশিক্ষা হবে।

শিশির যা বলছে তা খাঁটি কথা সেটা সমরবাবু বোঝেন। তিনি তাই জিজ্ঞাসা করেন, পড়াশোনার প্রতি ছেলেদের আগ্রহ জাগানোর জন্য আপনার মতে কী করা উচিত, শিশিরবাবু ?

শিশির বলে, এ সম্বন্ধে আমার এক পরিকল্পনা আছে, তা আমি সবিস্তারে আপনাকে লিখে দেবো। কিন্তু একটি কথা— তাতে ছেলেদের কিছু বেশী স্বাধীনতা, সমালোচনার অধিকার এবং পুরানো রীতির পরিবর্তন করতে হবে। আপনি কি তাতে রাজী হবেন ?

সমরবাবু বলেন, নিশ্চয়ই ! শিশিরবাবু, ছেলেদের সত্যিকারের ভালর জন্য আমি সব কিছুতেই রাজী।

—তাহলে মোটামুটি আমার কথাগুলি বলি। ছেলেদের পড়াশোনায় আগ্রহ জাগাতে হলে সর্বপ্রথমে স্কুলটি তাদের কাছে এক আকর্ষণীয় প্রতিষ্ঠান করে তুলতে হবে। খেলার মাঠে যাওয়া

আর স্কুলে যাওয়া তাদের কাছে একইরকম আগ্রহকর করতে হবে। এজন্য স্কুলেও ছেলেদের খেলাধূলার ব্যবস্থা করতে হবে। ছেলেরা আপনা হতেই স্কুলে আসতে চাইবে, স্কুল পালানোর কথা কেউ কখনও ভাববে না। খেলাধূলার মধ্যে দিয়েই তাদের দেহ মন ও চরিত্র গঠন করতে হবে; সেজন্য স্কাউটিং, স্পোর্টস ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ভাল ব্যবস্থা করতে হবে।

'ছেলেদের যাঁরা শিক্ষা দেবেন তাঁরাও যাতে ছেলেদের কাছে আকর্ষণীয় ব্যক্তি হয়ে ওঠেন সে চেষ্টা করতে হবে। এজন্য ছেলেদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতে হবে। শিক্ষক সম্বন্ধে ছাত্রদের স্বাভাবিক ভীতি দূর করার জন্য প্রহার বন্ধ করতে হবে। ছাত্ররা যা শিখবে তা যেন শ্রদ্ধার সঙ্গে শেখে। ভয়ের সঙ্গে নয়। যে ছাত্র যে বিষয়ে কাঁচা, সেই বিষয়ের শিক্ষক তার উপর পৃথকভাবে দৃষ্টি রাখবেন। প্রয়োজন হলে এ-ধরনের ছাত্রদের নিয়ে বিশেষ ক্লাস করা উচিত। প্রতি সপ্তাহে ছাত্রদের পরীক্ষার প্রয়োজন; কি তারা শিখছে এবং কতটুকু শিখছে এ সম্বন্ধে শিক্ষকদের সর্বদা অবহিত থাকা উচিত।

'শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে ছাত্রদের মতামত সযত্নে সংগ্রহ করতে হবে। পাঠ্যবস্তু তাদের কাছে কতটুকু প্রাঞ্জল হচ্ছে, পাঠদানের পদ্ধতি তাদের ভাল লাগছে কিনা এগুলি জানা কর্তব্য। সম্ভব হলে ছাত্রদের অভিরুচি অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। বড় হয়ে যার যেদিকে যাবার ইচ্ছা ছেলেবেলা হতে তাকে সেদিকে যাবার উপযোগী ব্যবস্থা করে দেওয়া

উচিত। মেধাবী ছাত্রদের পাঠ্যতালিকার বাইরের বই হতে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ করে দিতে হবে, দরিদ্র ছাত্রদের পাঠ্য-পুস্তক কেনার জন্য আর্থিক সাহায্য করতে হবে।

'স্কুল হতে সমস্ত ছাত্রের মধ্যাহ্নের জলযোগের ব্যবস্থা করা দরকার। ক্ষুধিত বালকদের ক্লান্ত মস্তিষ্ক পাঠ গ্রহণে অক্ষম।

—কিন্তু এসব ব্যবস্থা করার জন্য যে বেশ কিছু অর্থ চাই, একটু চিন্তিতভাবে সমরবাবু বলেন।

শিশির বলে, অর্থ সাহায্যের জন্য আপনি গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করুন। বিশ্ববিদ্যালয়কে জানান এগুলি করা একান্ত কর্তব্য। তবুতো আমি শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন সম্বন্ধে এখনো কিছু বলিনি, শুধু শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধেই বলছি। ছেলেদের সুশিক্ষার জন্য এগুলি করা নিতান্ত প্রয়োজন।

সমরবাবু বলেন, আচ্ছা দেখা যাক। যতদূর আমাদের সাধ্য করা তো যাক।

বয়স অল্প বলে ভবেনবাবুর সব কাজেতেই একটু উৎসাহ আছে। তিনি তাই বলেন, ছেলেদের Proper and particular care নিতে অবশ্য অর্থের চেয়ে আন্তরিকতাই বেশী প্রয়োজন। শিশিরবাবুর কথামত ছেলেদের পড়াশোনার ব্যাপারে যত দূর যত্ন নেবার আমরা নেব।

সমরবাবু বলেন, শিশিরবাবু, আপনার কথামত স্কুলে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার আমি চেষ্টা করছি। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, এতদিন হেডমাস্টারি করছি কিন্তু প্রকৃত মানুষ কটাই বা

আর গড়তে পারলাম! আমাদের শিক্ষার ফলে শুধু সৃষ্টি হচ্ছে বাঁধা বুলি মুখস্থ করা তোতাপাখীর দল। অসংখ্য পণ্ডিতমূর্খ! সত্যিকারের শিক্ষিত শেষ পর্যন্ত হাজারে একজন হয়।

শিশিরের পরিকল্পনা অনুযায়ী স্কুলে শিক্ষাদান শুরু হয়। ফলাফল কিন্তু সকলের কাছে প্রীতিকর হয় না। স্কুলের পরিচালকদের যেমন নোটিস বোর্ড আছে, স্কুল সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি সেখানে আঁটা হয়—ঠিক তেমনি ছাত্রদের জন্য শিশির এক নোটিস বোর্ড করে দেয়, স্কুল সম্বন্ধে তাদের বক্তব্য সেখানে লেখা হবে। তারা সেখানে কে ক্লাসে থুতু ফেলেছে, কে দেয়ালে পেন্সিল দিয়ে নাম লিখেছে ইত্যাদি লেখে। ফলে নাম প্রকাশের লজ্জায় ও ভয়ে ছেলেদের মধ্যে এই ধরনের অপরাধ ক্রমশ কমে যাচ্ছিল। হঠাৎ সেই বোর্ডে একদিন এক ছড়া দেখা গেল—

পণ্ডিতমশাই ক্লাসেতে ঘুমায় সারাক্ষণ,
ক্লাস ফোরের ছাত্ররা কয়, শোন সর্বজন।

টিফিনের সময় ছড়াটা পণ্ডিতমশাইয়ের নজরে পড়ে। তিনি রেগে আগুনে বোমা হয়ে একেবারে ফেটে পড়েন। গজ গজ করতে করতে টীচার্স রুমে ঢোকেন, হতভাগা মর্কটের দল! সাপের পাঁচ পা দেখেছ? পরীক্ষার সময় সব দেখা যাবে।

ভবেনবাবু জিজ্ঞাসা করেন, কি হলো, পণ্ডিতমশাই ?

—সব কবি হয়ে উঠেছেন, বোর্ডে ছড়া লিখছেন। যত হতভাগা। গুরুজনদের নিয়ে বাঁদরামি।

ব্রজেনবাবু বলেন, ছেলেদের স্পর্ধা দেখছি দিন দিন বেড়ে উঠছে।

শান্তিবাবু টিপ্পনী কাটেন, উঠবে না কেন? নাই দিলে সকলেই মাথায় ওঠে। শিশিরবাবুর শিক্ষা পদ্ধতির ফল ফলেছে।

অমলবাবু আবার শান্তিবাবুর উপর যান মন্তব্যে। বলেন, শুধু ফলেছে! ফল পেকেছে।

ব্রজেনবাবু বলেন, আগে কোন ছেলে মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে সাহস করত না, বেতিয়ে সব টিট করতাম। শিশিরবাবু আবার এখন স্কুলে মার বন্ধ করেছেন।

বৃদ্ধ বিনয়বাবু একটু ব্যঙ্গের সুরেই বলেন, কালে কালে কতই দেখব? ত্রিশ বছর মাস্টারি করছি, কত ছেলে জজ ম্যাজিস্ট্রেট হলো আমাদের হাত দিয়ে, এখন শুনছি আমরা পড়াতে জানি না, শেখাতে পারি না!

পণ্ডিতমশাইয়ের রাগ এখনো পড়েনি। তিনি বলেন, কথায় বলে মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি। লাঠির ওষুধ ছাড়া মূর্খেরা মানুষ হয়? এরা হয়ে উঠেছে একেবারে মর্কট। সেদিন ক্লাসে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলাম, মর্কটগুলো সেই সুযোগে আমার শিখাকর্তনের উদ্যোগ করেছিল।

শিশির এতক্ষণ নীরবে এদের সব অভিযোগ শুনে যাচ্ছিল। সে জানে নতুন কিছু করতে হলে এ-ধরনের বাধা বিপত্তি ও আপত্তির সম্মুখীন হতে হবে। তাই সে এদের কথায় কোন গুরুত্ব দিচ্ছিল না। কিন্তু পণ্ডিতমশাই না পড়িয়ে ঘুমান শুনে সে মৃদু হেসে বলে, সে কি পণ্ডিতমশাই, ক্লাসে ঘুমাচ্ছিলেন? দিবানিদ্রা কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর।

বিনয়বাবু শিশিরের শেষ কথায় কোন গুরুত্ব দেন না। বলেন, আমাদের আবার স্বাস্থ্য! ছু পিরিয়ড গলা ফাটিয়ে চীৎকার করার ফলে ফুসফুস সুদ্ধ ঝাঁজরা হয়ে যায়।

সুধীরবাবু বলেন, আপনি শুধু স্কুলের ছু পিরিয়ডই হিসাবে ধরলেন। আর প্রাইভেট টিউশনিগুলো! সকাল থেকে শুরু করে রাত দশটা পর্যন্ত তো গাধা পিটানো। বরং স্কুলের ক্লাস নেওয়া মানে একটু বিশ্রামের সুযোগ পাওয়া।

ভবেনবাবু একটু দুঃখের সঙ্গে বলেন, সত্যি পেটের জন্য আমরা পাণ্ডিত্যের অপমান করতে বাধ্য হচ্ছি। বিদ্যাদানের বদলে বিদ্যাবিক্রয় করছি; শুধু important passageগুলি লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে দিই, ছাত্ররা মুখস্থ করে। ব্যাস্, হয়ে গেল অধ্যাপনা!

শান্তিবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, ঘেন্না ধরে গেল জীবনে। আগে ভাবতাম শিক্ষকের স্থান সমাজের অনেক উঁচুতে, জাতির ভবিষ্যৎ তারাই গড়ে। এখন দেখছি সব বাজে কথা। স্কুলমাস্টাররা ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়ার চেয়ে অধম। এক একবার ভাবি মাস্টারি

ছেড়ে অন্য কিছু করি। কিন্তু কী বা করবো? কোন পথ নেই। ভগবান জানেন কবে দুঃখ ঘুচবে, একটা পরিবর্তন হবে।

শান্তিবাবুর কথার জবাবে সুধীরবাবু বলেন, কেন, পরিবর্তন তো হয়েছে। ঐ যে শিশিরবাবুর স্কিম। গোদের উপর বিষ ফোড়া! শিক্ষকরা আরও খাটুক, ছাত্রেরা তাদের সমালোচনা করুক।

সুধীরবাবুর কথায় পণ্ডিতমশাই আরও জ্বলে ওঠেন। বলেন, গুরুজনের সমালোচনা? অ্যাঁ? এরপর মান সম্ভ্রম বজায় রেখে এখানে চাকরি করাই দায় হবে। আজ ছড়া কাটছে, কাল বক দেখাবে, পরশু সামনে এসে বিড়ি ধরাবে। শিশিরের দিকে ফিরে বলেন, খুব যাহোক স্কিম করেছেন, শিশিরবাবু! মানুষের বদলে মর্কট তৈরী হচ্ছে।

অমলবাবু বলেন, মর্কট হলে তো ছিল ভাল। আমাদের পূর্বপুরুষ! গাধা—গাধা তৈরী হচ্ছে সব।

শান্তিবাবু বলেন, আরে মশাই বলব কী! যেমন শিশিরবাবু, তেমনি হেডমাস্টার। মাইনে বাড়াবার কথা বলতে গেলাম,—বল্লেন যে ফাণ্ড নেই। ওদিকে আজে বাজে একগাদা খরচ—স্পোর্টস, এক্সকারশন, ফ্রি টিফিন; আর আমাদের হাঁড়ি চড়ে না।

বিনয়বাবু ব্যঙ্গস্বরে শিশিরকে আক্রমণ করে বলেন, কই শিশিরবাবু, এর একটা স্কিম, একটা বিহিত করতে পারেন না?

এঁদের কথার জবাবে শিশির শান্ত স্বরে বলে, বিহিত করা তো আমার একলার সাধ্য নয়। আপনাদের অভাব অভিযোগের জন্য আমায় দায়ী করছেন কেন? আমিও তো আপনাদেরই মত একজন শিক্ষক। আমায় দোষ দিলে তো কোন লাভ হবে না। আর্থিক দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য আমাদের আন্দোলন করতে হবে, আমাদের দাবি যথাস্থানে পেশ করতে হবে। কিন্তু অবস্থার প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারি না। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের মহান ব্রত আমরা গ্রহণ করেছি। কিন্তু আমাদের কর্তব্যে অবহেলা সকলের সামনে কী আদর্শ তুলে ধরবে?

শিশিরের এই প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারে না। শিশির পণ্ডিতমশাইকে বলে, পণ্ডিতমশাই, ক্লাসে পড়াতে গিয়ে দেখি খুব কম ছেলেই চোখ তুলে সোজা উত্তর দিতে পারে। তারা এমন ভাবে চায় যেন সামনে বিভীষিকা দেখছে, তাদের সে চাহনিতে প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পাই না। ছাত্র শিক্ষককে দেখে ভয়েই জড়সড়। ওর নাম কি সম্মান বলতে চান? ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক তো এ নয়, তাদের সম্পর্ক স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধা-ভালবাসায় ভরা। কিশোরদের কচি মনটাকে ভয় দেখিয়ে মুচড়ে দুমড়ে দিলে তা বিকশিত হবে কেমন করে বলতে পারেন?

এ কথারও কেউ জবাব দিতে পারেন না। সকলের উদ্দেশ্যে শিশির বলে, ছাত্ররা আমাদের পড়ানোর সমালোচনা করেছে, এতে আপনারা রাগ করছেন। ছাত্রদের দোষত্রুটিগুলি আমরা

দেখিয়ে দিই, তারা সংশোধন করে। তেমনি আমাদের দোষ-ত্রুটিগুলি যদি তারা দেখিয়ে দেয় তাতে সংশোধন করারই তো সুবিধা। পরস্পরের সমালোচনায় শিক্ষার উন্নতি। এর মধ্যে অসম্মান কোথায়? তবে হ্যাঁ, বহুদিনের শাসনের গণ্ডি পেরিয়ে ওরা একটু স্বাধীনতা পেয়েছে। তাই হয়তো আনন্দে একটু উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ, দুদিন শুধু ওদের আনন্দের আতিশয্য একটু সহ্য করুন। আপনাদের সহযোগিতা না পেলে কোনও পরিকল্পনা যে সফল হবে না।

টিফিন শেষ হওয়ার ঘণ্টা বাজে। ভবেনবাবু বলেন, টিফিন শেষ হলো। চলুন, ক্লাসে যাওয়া যাক।

সকলে আসন পরিত্যাগ করে। কক্ষ ত্যাগ করার আগে শিশির বলে, অনেক হয়তো অপ্রিয় কথা বল্লাম, কিছু মনে করবেন না।

শান্তিবাবু চুপি চুপি অমলবাবুকে বলেন, একেবারে বদ্ধ পাগল।

কথাটা ভবেনবাবুর কানে যায়। শিশিরের কথাগুলি তাঁর মনে লেগেছে, তাই তিনি বলেন, জগতে প্রতিভাবানদের ওই আখ্যাই হয়ে থাকে, শান্তিবাবু। শিশিরবাবুর কথাগুলো সত্যি। আমাদের দিক থেকে ছাত্রদের আমরা চিরদিন বিচার করেছি, কিন্তু ওদের দিক থেকে ওদের মন নিয়ে কোনদিন বিচার করিনি।

ব্রজেনবাবু পরিহাস করে বলেন, তবে আর কী। কাঁধে কাঁধ দিয়ে লেগে যান।

সকলে কক্ষত্যাগ করলে ব্রজেনবাবুকে একান্তে ডেকে পণ্ডিত-মশাই বলেন, এর বিহিত আমি করছি। দাঁড়ান না। হেড-মাস্টার সেক্রেটারিকে বলে কোন ফল হবে না। আমি ছেলেদের অভিভাবকদের দিয়ে শিশিরবাবুর নামে রিপোর্ট করাবো।

সেদিন ক্লাসে পড়াতে পড়াতে শিশির লক্ষ্য করে একটি ছেলে অন্যমনস্ক হয়ে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে। শিশির জিজ্ঞাসা করে, তুমি মন দিয়ে শুনছো না কেন?

—আজ স্যার ভাল লাগছে না।

—কেন বলো তো?

অন্য একজন বলে, ক্লাসরুমটা বড্ড গরম, স্যার।

সঙ্গে সঙ্গে এক শেয়াল ডাকতেই সব শেয়াল ডাকার মত ছেলেদের মন্তব্য শুরু হয়ে যায়।

—বড্ড মাথা ধরে গেছে গরমে, স্যার।

—বড় ঘুম পাচ্ছে, স্যার।

—হুঁ! মোটকথা তোমাদের পড়তে মন লাগছে না। বড় একঘেঁয়ে লাগছে? আচ্ছা ক্লাসরুমের বাইরে খোলা হাওয়ায় গাছের ছায়ায় বসলে পড়তে মন লাগবে?

ছেলেরা প্রায় সবাই সঙ্গে সঙ্গে বলে, লাগবে, স্যার, নিশ্চয়ই মন লাগবে।

—চলুন, স্যার! চলুন!

—এখানটা মোটে ভাল নয়, স্যার। বাইরেটা খুব ভাল।

অজয় একটু অবাক হয়ে রবিকে বলে, সে কিরে! বাইরে পড়াবে কি?

রবি বলে, মজা মন্দ হবে না।

শিশির বলে, চলো, সব বাইরেই চলো।

ঘরের বাইরে মাঠে তারা সবাই যায়। একটি বড় গাছের তলায় শিশির পড়ার স্থান নির্বাচিত করে। অজয় রবি প্রভৃতি ক্লাসের দু একটি নামজাদা দুষ্টু ছেলে গাছের উপর চড়ে বসে।

শিশির তাই দেখে বলে, তোমরা কি ওখানেই বসবে? আচ্ছা, বসো! ওটা উচ্চাসন—ওখানে বসতে হলে প্রকৃত অধিকারী হওয়া চাই। যে নির্ভুল উত্তর দিতে পারবে সে ওখানে বসবে।

রবি বলে, আমরা স্যার নির্ভুল উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

Very good! বলে শিশির আবার পড়ান শুরু করে।

এদিকে স্কুলের ইন্সপেক্টর হঠাৎ হাজির হন। সটান তিনি সমরবাবুর ঘরে ঢোকেন।

সমরবাবু অবাক হন, বলেন, একি! আপনি হঠাৎ—

ইন্সপেক্টর গম্ভীরভাবে বলেন, হঠাৎ-ই এলাম আপনার স্কুল দেখতে।

শশব্যস্তে সমরবাবু বলেন, বসুন, বসুন।

—না, থাক। চলুন আগে একবার ক্লাসগুলি ঘুরে দেখি।

চলুন। সমরবাবু ইন্সপেক্টরকে নিয়ে অগ্রসর হন।

একবারে বাচ্ছা ছেলেদের ক্লাসে বসে বিনয়বাবু দিব্বি ঝিমুচ্ছেন, আর ছেলেরা তারস্বরে চেঁচিয়ে পড়ছে—বি-এল-এ ব্লে। বি-এল-ই ব্লি। বি-এল-আই ব্লাই।

একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, স্যার, ব্লাই মানে কি?

বিনয়বাবুর তন্দ্রা ভেঙে যায়। তিনি একটু রাগের সঙ্গেই বলেন, অতো মানে জেনে দরকার কী? পড়ে যা—গড় গড় করে সব পড়ে যা!

ছেলেরা প্রাণপণে চীৎকার করে পড়ে।

দরজার আড়াল থেকে দেখে ইন্সপেক্টর মন্তব্য করেন, একবারে হাট বসেছে!

শান্তিবাবুর ক্লাসে দেখা যায় বোর্ডে ছেলেদের জন্য একগাদা অঙ্ক লিখে তিনি নিশ্চিন্ত মনে উপন্যাস পড়ছেন।

ছেলেরা পরস্পারের খাতা হতে অঙ্ক টুকে নিচ্ছে, কেউ কাটাকাটি খেলছে, কেউ পাতায় ছবি আঁকছে।

এই দেখে ইন্সপেক্টর একটু শ্লেষের সঙ্গে বলেন, মাস্টারমশাই দেখছি সবচেয়ে মনোযোগী ছাত্র।

পণ্ডিতমশাই তাঁর ক্লাসে চিরাচরিত প্রথানুযায়ী নিদ্রা

দিচ্ছিলেন। ছেলেরা কাগজের বল তৈয়ারি করে পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করে। দু একটি বল ছিটকে ক্লাসের বাইরে বারান্দায় এসে পড়ে একেবারে ইন্সপেক্টরের গায়ের কাছে। তিনি হেডমাস্টারের মুখের দিকে চান, সমরবাবু ছেলেদের আচরণে লজ্জিত হয়ে চোখ নামান।

ছেলেদের গোলমালে হঠাৎ পণ্ডিতমশাইয়ের ঘুম ভাঙে। তিনি সামনে উপবিষ্ট একটি নিরীহ ছেলেকেই ডাকেন, এদিকে আয়!

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে উঠে আসে।

—গোলমাল করছিস কেন? শীগ্‌গির গৌরাঙ্গ হ, শীগ্‌গির—

ছেলেটি মাথার উপরে হাত তুলে দাঁড়ায়।

—চোখ উপরে তুলে জিভ বের করে দাঁড়া। বল্—প্রভু হে, ক্ষমা করো। আমি মহা অপরাধী।

ছেলেটি সভয়ে আবৃত্তি করে। সম্প্রতি ছাত্রদের মারা নিষিদ্ধ হয়েছে বলে পণ্ডিতমশাই অভিনব সব শাস্তিদানের পদ্ধতি আবিষ্কার করছেন।

ইন্সপেক্টর মৃদু হেসে বলেন, উনি বুঝি পাপী তরাচ্ছেন!

পরের ক্লাসরুমটির কাছে এসে ইন্সপেক্টর আরও অবাক হন। ক্লাস একেবারে ফাঁকা। তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে হেডমাস্টারের মুখের দিকে চেয়ে বলেন, সবাই স্কুল পালিয়েছে?

—না। বোধ হয় বাইরে আছে। সমরবাবু জানেন এটা শিশিরের ক্লাস, কোন কারণে সে হয়তো সকলকে বাইরে নিয়ে গেছে।

ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করেন, ড্রিল করছে?

—না। পড়ছে। শিশির নিশ্চয়ই ছেলেদের বাইরে পড়াচ্ছে এ বিশ্বাস সমরবাবুর আছে, কিন্তু ইন্সপেক্টরের কাছে সেকথা বলতে তিনি দ্বিধা করেন।

ইন্সপেক্টর পড়ানোর যা ধারা দেখছিলেন, তাতে একথায় একটু বিস্মিত হয়ে বলেন, সে কি! ক্লাস ছেড়ে মাঠে গিয়ে পড়ছে? Strange! ক্লাসের মধ্যেই পড়ার যা নমুনা দেখলাম। চলুন!

সমরবাবু ইন্সপেক্টরকে নিয়ে চলেন মাঠে যেখানে শিশির ক্লাস নিচ্ছে।

দূর হতে তাঁদের দুজনকে আসতে দেখে অমূল্য শিশিরকে বলে, স্যার, হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে বোধ হয় ইন্সপেক্টর আসছেন।

ছেলেরা ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াতে যায়। শিশির তাদের বলে, ও কী! বসো, বসো সব। ইন্সপেক্টর আসছেন তো কী হবে? তিনি পরিদর্শন করবেন, চলে যাবেন; তোমরা ব্যস্ত হ'য়ো না। মন দিয়ে পড়া শোনো। হ্যাঁ, কী বোঝাচ্ছিলাম? বাঙালী জাতির ইতিহাস আর বৈশিষ্ট্যের কথা! শোনো—

ইন্সপেক্টর ও হেডমাস্টার এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে শিশিরের পড়ানো শোনেন।

শিশির বলে চলে, তাহলে তোমরা শুনেছ ভারতবর্ষে বহু বিদেশী জাতি আসে, আর্য হতে আরম্ভ করে গ্রীক শক হূন পাঠান মোগল প্রভৃতির আগমনের কথা তোমরা পড়েছ। এদের সকলের আচার-ব্যবহার-সংস্কৃতি নিয়েই গঠিত হয়েছে ভারতের সভ্যতা। কবির ভাষায় 'হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন' একেবারে লীন হয়ে গেছে। এই বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণের ফলটা যেন প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে বাঙালীদের মধ্যে। বাঙালীদের প্রতিভা হয়েছে সর্বতোমুখী আর জীবন হয়েছে বৈচিত্র্যময়। আর্যের ধর্মপ্রাণতা ও আদর্শবাদ, দ্রাবিড়ের কলাবিদ্যা ও ভক্তিমত্তা আর মঙ্গোলের বুদ্ধিকৌশল ও দুর্ধর্ষতা বাঙালী জাতির মধ্যে একাধারে দেখা যায়। সেজন্য বাঙালী একসঙ্গে তীক্ষ্ণবুদ্ধিমান ও ভাবুক, অনুকরণপ্রিয় ও সৃষ্টিক্ষম, আদর্শবাদী ও মায়াবাদবিদ্বেষী।

শিশিরের বক্তব্য ইন্সপেক্টর মন দিয়ে শোনেন। আরও শোনার জন্য তাঁর এত আগ্রহ হয় যে সমরবাবু যখন তাঁকে অন্যান্য ক্লাস পরিদর্শন করার জন্য বলেন, তখন তিনি হাতের ইঙ্গিতে তাঁকে নিরস্ত করেন। ছাত্রদের মত তিনিও একপাশে চুপি চুপি বসে পড়েন এবং সমরবাবুকেও বসতে বলেন। তাঁর অঙ্গে দামী স্যুট থাকা সত্ত্বেও তিনি যে সটান মাটির উপর বসে পড়লেন এটা তাঁর খেয়ালই রইল না।

শিশির ছেলেদের কাছে দৃষ্টান্ত দিয়ে তার বক্তব্যকে সমর্থন করে। বলে, এদেশে ভাবুক কবি জয়দেব, চণ্ডীদাস, রবীন্দ্রনাথ যেমন জন্মেছেন, তেমনি জন্মেছেন বীর কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, সুভাষচন্দ্র। দীপঙ্কর, রঘুনাথ বিদেশ জয় করেছেন বুদ্ধিতে, বিজয়সিংহ জয় করেছেন শক্তিতে। আদর্শবাদী বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ, অরবিন্দ জন্মেছেন; আবার কর্মী বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু, প্রফুল্ল রায় জন্মেছেন। কত নাম করব? সমাজ ও সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে বহুবার বাংলা তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। মানবের ইতিহাসে বাংলার অবদান কম নয়।

ইতিমধ্যে ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ে।

শিশির তার বক্তব্য শেষ করে আনে। বলে, এখন দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাস রচনার ভার তোমাদের উপর। তোমাদেরও কথা যাতে একদিন ইতিহাসে লেখা হয় সেই চেষ্টা তোমাদের করতে হবে। তবেই ইতিহাস পাঠ হবে সার্থক। আচ্ছা আজ এই পর্যন্ত। সামনের দিন আবার বাংলার প্রতি জেলার অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্যের কথা বলব।

ছেলেরা উঠে স্কুল বাড়ির দিকে যায়। সমরবাবু ইন্সপেক্টরকে নিয়ে শিশিরের কাছে এগিয়ে পরিচয় করিয়ে দেন। শিশির নমস্কার করে।

ইন্সপেক্টর মৃদু হেসে বলেন, আপনার পড়ানো শুনে আবার ছাত্রজীবনে ফিরে যেতে ইচ্ছা করছিল। ঘর ছেড়ে মাঠের মাঝে ক্লাস আমাকে শান্তিনিকেতনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।—

অবশ্য প্রথমে আমি একটু শঙ্কিত হয়েই এসেছিলাম। অথচ আশ্চর্য! আপনারই বিরুদ্ধে একগাদা অভিযোগ পেয়েই আমাকে ছুটে আসতে হয়েছে।

সমরবাবু ও শিশির দুজনেই একথায় একটু অবাক হয়।

ইন্সপেক্টর বলেন, এখানকার ছাত্রদের অনেক অভিভাবক আমায় চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে শিশিরবাবুর কুশিক্ষা পেয়ে নাকি ছেলেরা উচ্ছন্নে যাচ্ছে।

সমরবাবু ও শিশির আরও অবাক হয়, বোঝে এ নিশ্চয়ই কারুর ষড়যন্ত্র।

ইন্সপেক্টর অন্য প্রসঙ্গে আসেন। শিশিরের মুখের দিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চান। মুখটা তাঁর খুব চেনা চেনা লাগছে অথচ ঠিক স্মরণ করতে পারেন না। বলেন, আচ্ছা, এর আগে আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

মনে মনে ভাবেন, কোথায়? বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের সময়? বিদেশে ছাত্রজীবনে? কোন বিশেষ সভায় সম্মানিত অতিথিরূপে? কিন্তু সেরকম একজন বিখ্যাত ব্যক্তি এক অখ্যাত স্কুলের সামান্য বেতনের শিক্ষক কেমন করে হবে?

চিন্তাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে ইন্সপেক্টর আবার বলেন, শিশিরবাবু, আপনার পড়ানো আমার খুব ভাল লেগেছে।

সমরবাবু বলেন, স্কুলে ছেলেদের শিক্ষাদান সম্বন্ধে শিশিরবাবুর এক পরিকল্পনা আছে। তবে অর্থাভাবে সব সম্ভব হচ্ছে না। আপনি যদি এ বিষয়ে—

ইন্সপেক্টর কথা শেষ করতে না দিয়েই বলেন, আমার দ্বারা যতদূর সম্ভব আমি ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব। পরিকল্পনাটি বিশদভাবে আমায় জানাবেন। আমি কথা দিচ্ছি আপনার পরিকল্পনা অনুসারে ছেলেদের যদি পড়াশুনায় আগ্রহ জাগানো যায়, তাদের প্রকৃত মানুষ করা যায়, তবে আমি সব স্কুলকে নির্দেশ দেব আপনার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে।

শিশির বলে, পরীক্ষার ফল দেখেই আমার পরিকল্পনার বিচার করবেন। সাধারণতঃ, ভাল ছেলেরা স্বভাবতই পড়াশুনায় ভাল। আমি দুষ্টু খারাপ ছেলেদেরও ভাল করে তুলব।

আপনার সাফল্য কামনা করি, বলে শিশির ও সমরবাবুর সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করে ইন্সপেক্টর খুশী মনেই বিদায় হন।

বেচারা পণ্ডিতমশাই। তাঁর সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলো, বরং ইন্সপেক্টর হঠাৎ পরিদর্শন করে তাঁর সম্বন্ধেই এক বিরূপ ধারণা নিয়ে গেলেন।

হস্টেলে সকালে পড়ার সময় অজয় বিছানায় পড়ে থাকে। সকলে বই খুলে বসে, আর সে আরামে শুয়ে থাকে।

শক্তি বলে, অজয়, তোমার কি শরীর খারাপ? তুমি এখনো শুয়ে রয়েছ?

অজয় চোখ না খুলেই বলে, উঠতে ইচ্ছা করছে না।

শক্তি মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলে, ছি, ওঠো। বই খুলে বসো। নতুন স্যার আজকাল হঠাৎ ঘরে ঢুকে দেখে ছেলেরা কী রকম পড়ছে।

—ভয় নেই, এ ঘরে ঢুকবে না।

—কেন?

—জানে তোরা ভাল ছেলে ঠিক পড়ছিস।

—তোমার জন্য তো আসতে পারেন।

—আমার জন্য আসবে না, আমি পড়ছি টের পাবে।

শক্তি অজয়ের কথা ঠিক বোঝে না এবং এ নিয়ে আর অজয়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে না। ঘরের আর তিনজন নিজেদের পড়ায় মন দেয়। একটু বাদে বারান্দায় শিশিরের পায়ের শব্দ শোনা যায়। অজয় অমনি বিছানায় শুয়ে চোখ বুঁজে চেঁচিয়ে আবৃত্তি করে, Let ABC be a triangle in which side AC is equal to BC.

বারান্দা হতে শিশির অজয়ের স্বর শুনে আস্তে আস্তে

নিজের ঘরে ফিরে যায়। মন দিয়ে ছেলেরা যখন পড়ছে তখন আর ঘরে ঢুকে লাভ নেই সে ভাবে।

শৈলেন বলে, পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেছে রে। বেশ বুদ্ধি বের করেছিস, বই-টই না খুলে বিছানায় শুয়ে শুয়েই চীৎকার।

অজয় সগর্বে বলে, আরে দূর, কে অতো বই খোলার হাঙ্গামা করে! কি রকম subject পড়লাম বল্ তো? AB, BC, CD করে বকে গেলেই হলো।

শৈলেন বলে, আমারও যে শুতে ইচ্ছা করছে। আমি চোখ বুঁজে কি নিয়ে চেঁচাব বল্ তো?

অজয় বলে, তুই গজঃ গজৌ গজাঃ বলে চেঁচা।

—বহুৎ আচ্ছা! শৈলেন অজয়ের বুদ্ধির তারিফ করে।

কিন্তু ওদের এই শয়তানী বুদ্ধি অমূল্যর কাছে গোপন থাকে না। সে শিশিরের ঘরে এসে বলে, স্যার, অজয় পড়ার সময় বিছানায় শুয়ে থাকে। আপনার পায়ের আওয়াজ পেলেই বাজে চীৎকার করে।

শিশির খবরটা শুনে গম্ভীর হয়ে বলে, আচ্ছা, তুমি যাও, আমি দেখব।

অমূল্য আরও বলে, বলবেন না স্যার আমি বলে দিয়েছি। আমায় আবার তাহলে মারবে।

শিশির বলে, তোমার উচিত হয়নি নালিশ করা। সে তোমার বন্ধু, তোমার উচিত ছিল আমাকে না বলে তাকেই বলা।

অমূল্য শিশিরের কথায় একটু অবাক হয়। ভাবে, নতুন স্যারের সব কথাই অদ্ভুত।

বারান্দায় শিশিরের পায়ের শব্দ শুনে শৈলেন অজয়কে সতর্ক করে দেয়। বলে, স্যার আসছেন।

অজয় অবজ্ঞা ভরে পাশ ফিরে বলে, আসতে দে। তারপর চোখ বুঁজে আওড়ায়, AB equal to BC, CD equal to DC…

শিশির দরজার কাছে একটু থেমে অজয়ের ফাঁকি দেখে মৃদু হাসে। তারপর পা টিপে গিয়ে তার মাথার কাছে দাঁড়ায়।

অজয় একটু পরে শৈলেনকে জিজ্ঞাসা করে, গেছে রে?

শিশির সামনে দাঁড়িয়ে থাকায় শৈলেন কোন কথা বলতে পারে না।

জবাব না পেয়ে বিরক্ত হয়ে চোখ খুলে অজয় তাকে জিজ্ঞাসা করে, জবাব দিচ্ছিস না কেন?

শৈলেন তবু নীরব থাকায় অজয়ের সন্দেহ হয়। মাথার দিকে চাইতেই শিশিরকে দেখতে পায়। ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বই খোলে।

শিশির আস্তে আস্তে তার পাশে এসে বসে বলে, আজ বুঝলাম তুমি চেঁচিয়ে রোজ geometry পড় কেন।

অজয় বলে, ওটাতে আমি কাঁচা, স্যার।

অজয়ের উপস্থিত বুদ্ধি দেখে শিশির একটু হেসে বলে

আর পাকা কিসে? দুষ্টুমিতে?...শোন, আমি টের পেয়েছি তুমি মোটে পড় না, খালি ফাঁকি দাও।

—কে বল্লে, স্যার?

—যেই বলুক, পড় না কেন?

—ভাল লাগে না, স্যার। অজয় অকপট স্বীকারোক্তি করে।

শিশির একটু ভেবে নিয়ে বলে, আচ্ছা! ভাল লাগার ব্যবস্থা করলে তখন পড়বে তো? পড়াশোনা না করলে কিন্তু জীবনে বড় হতে পারবে না।

শিশির ঘরের অন্য সকলের দিকে ফিরে বলে, তোমরা জীবনে বড় হওয়ার স্বপ্ন নিশ্চয়ই দেখো—কেউ হবে বড় ডাক্তার, কেউ হবে নামকরা ইঞ্জিনিয়র, কেউ হবে নামজাদা সেনাপতি, এরোপ্লেনের পাইলট, দেশের মন্ত্রী, আরও কত কী। কত কিছু তোমাদের জানতে হবে, শিখতে হবে, দেখতে হবে, তবেই জীবনের স্বপ্নগুলি সফল হয়ে উঠবে। তাই পড়াশোনা না করে উপায় নেই। অবশ্য বইয়ের পাতার বাইরে যে একটা বিরাট জগৎ আছে তার সঙ্গে আমি তোমাদের কিছু পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করব। সামনেই আসছে পূজোর ছুটি, এ ছুটিতে আমি তোমাদের নিয়ে দেশ ভ্রমণে বের হব ভাবছি। নানা দেশ ঘুরে অনেক কিছু জানা যাবে, অনেক দেখা যাবে

শিশিরের কথায় ঘরের সকলেই উৎসাহিত ও আনন্দিত হয়।

পূজার ছুটিতে শিশির ছেলেদের সব নিয়ে বের হয়ে পড়ে। দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়, কখনো ট্রেনে চেপে এক শহর হতে অন্য শহরে, কখনো পায়ে হেঁটে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে, কাঁধে কিট্‌ব্যাগ ঝুলিয়ে দুরূহ পার্বত্য পথে, জলপথে এক বন্দর হতে অন্য বন্দরে। ঐতিহাসিক স্থানের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ছাত্রেরা সাগ্রহে দেখে......প্রাচীন বাংলার রাজধানী গৌড়...পলাসীর আমবাগান......দার্জিলিংয়ের চা বাগান......রাঙামাটির দেশ বীরভূম...রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন...আসানসোলের কয়লার খনি...বার্নপুরের লোহার কারখানা...

বিজ্ঞানের নানা অবদান ছেলেরা দেখে। প্রত্যক্ষভাবে দেশের ভৌগোলিক জ্ঞান অর্জন করে, নানা ধরনের মানুষের আচার-ব্যবহার জীবনযাত্রার সঙ্গে তারা পরিচিত হয়, প্রকৃতির কাছ হতে বহু পাঠ গ্রহণ করে। চাষীদের দুঃখ-দুর্দশা তারা প্রত্যক্ষ করে। শিশির তাদের গ্রামে নিয়ে গিয়ে আর্ত-পীড়িতের সেবা করতে শেখায়। ছেলেরা অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের জানিয়ে দেয় মহামারী, ম্যালেরিয়া, কলেরার প্রতিষেধক ব্যবস্থা, সরল স্বাস্থ্যনীতি। দেশ হতে তারা নিরক্ষরতা দূর করার চেষ্টা করে।

ভ্রমণ, শিক্ষা, আনন্দ ও কাজের সমন্বয়ে পূজার ছুটি কাটে।

ছুটি শেষ হলে সকলে আবার হস্টেলে ফিরে আসে। এই দেশ-ভ্রমণ সকলের মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে রইল। ভবিষ্যতে এরই স্মৃতি মনকে মধুর করে তুলবে, সেদিন সতীর্থরা সব কে কোথায় ছড়িয়ে থাকবে তার ঠিক নেই। অথচ এই ভ্রমণের কাহিনী মনে এলেই তার সঙ্গে সঙ্গে সবাই এসে মনের দরজায় মৃদু টোকা দিয়ে সামনে দাঁড়াবে। অতীত দিনের হাত ধরে ফিরে আসবে হারানো সাথীরা, পিছনে ফেলে আসা জীবন।

আর এই ভ্রমণ হতে শিক্ষা যা পাওয়া গেল তারও শেষ নেই। তাই শক্তি অজয়কে বলে, এবারের ছুটিতে কত কী শেখা গেল, তাই নয় অজয়?

অজয় শক্তির দোলনায় দোলা দিতে দিতে বলে, হ্যাঁ। ছুটিতে বাড়ি গেলাম না বলে মা দুঃখ করে চিঠি লিখেছেন, কিন্তু ছুটিটা বেশ ভালই কেটেছে। তবে ছুটির পরে আবার সেই পরীক্ষা আর একঘেঁয়ে পড়া।

শক্তি বলে, আচ্ছা, তুই মন দিয়ে পড়িস না কেন? স্যার বলেন তোর যা বুদ্ধি, তুই পড়াশোনা করলে নিশ্চয়ই ফার্স্ট হতে পারবি। সত্যি অজয়, তুই যদি লেখাপড়াতে ফার্স্ট হতিস তো কী আনন্দই আমার হতো।

—হুঁ, আমি আবার ফার্স্ট হবো! নিজের উপর

অজয়ের এতোটা বিশ্বাস নেই, তাই অন্যের কথাতেও সে কোন গুরুত্ব দেয় না।

—তুই একটু চেষ্টা করলেই ফার্স্ট হবি। শক্তি দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

অজয় মৃদু হেসে বন্ধুর পাশে বসে। বলে, তুই থাকতে আমি কী করে ফার্স্ট হবো! তোর যা বুদ্ধি!

শক্তি অজয়ের কথার প্রতিবাদ করে বলে, আমার চেয়েও তোর অনেক বুদ্ধি। তোর মত দুষ্টুমি আমি হাজার চেষ্টা করলেও মাথায় আনতে পারব না। কিন্তু একটু চেষ্টা করলেই তোর মাথায় আমার মত বইয়ের পড়াগুলি ঢুকবে। তুই চেষ্টা কর্, অজয়, চেষ্টায় সব কিছু হয়।

অজয় হেসে বলে, তুই যে আমার মার মত কথা বলিস! আচ্ছা, এবার থেকে আমি চেষ্টা করব।

—শক্তি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, তুই তাহলে কথা দিচ্ছিস?

—হ্যাঁ।

এমন সময় রবি সেখানে আসে। রবিকে এ সময় বাগানে আসতে দেখে অজয় ও শক্তি একটু অবাক হয়। কারণ এবার ছুটির পর শিশির উদ্‌যোগী হয়ে স্কুলে এক বিজয়া সম্মিলনীর ব্যবস্থা করছে—ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক মিলিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্যের বন্ধন নিবিড় করবেন; ছাত্রদের নিয়ে এই অনুষ্ঠানে গান-আবৃত্তি অভিনয়ের আয়োজন করা হচ্ছে। শক্তি পঙ্গু বলে এবং অজয়ও ও-সব দিকে তেমন উৎসাহ নেই

বলে অনুষ্ঠানে কোন অংশ নিতে যায়নি। রবি প্রভৃতি মহা উৎসাহে মহলায় যোগ দিয়েছিল এবং এরা দুজনে বিকালে বাগানে এসে নিভৃতে আলাপ করছিল। রবির অকস্মাৎ এখানে আগমন তাই অপ্রত্যাশিত।

অজয় জিজ্ঞাসা করে, কি রে, তুই রিহার্সাল থেকে চলে এলি?

রবি মুখ ভার করে বলে, আমাকে পার্ট দিলে না। বলে আমার নাকি উচ্চারণ খারাপ, তাড়াতাড়ি কথা বলি।

অজয় রবির কথা শুনে গম্ভীর হয়ে যায়। বন্ধুদের সে ভালবাসে, তাদের অপমান সইতে পারে না। বলে, তোকে পার্ট দেয়নি? আচ্ছা, দেখবো কেমন করে ওরা থিয়েটর করে।

অজয়ের কথায় ভয় পেয়ে শক্তি বলে, না ভাই অজয়, কিছু করিসনি।

অপমানিত রবি অজয়ের কথায় প্রতিশোধ আর দুষ্টুমির আভাস পায়। উৎসাহিত হয়ে সে শক্তিকে ধমক দিয়ে বলে, তোর অতো মাথা ব্যথা কেন? তারপর অজয়কে বলে, শক্তিটার সব তাতে বাড়াবাড়ি। ওদের জন্য একেবারে দরদ উথলে উঠছে।

শক্তির নিষেধ অজয়েরও পছন্দ হয় না। র আসর হতে উঠে এমন উপদেশ দিস যেন তুইও মাস্টার।

শক্তি বলে, মাস্টার নই বটে, কিন্তু বন্ধু তো বটেই। আ[illegible] কাজ তোকে আমি করতে দেবো না। [illegible]ঠে, মঞ্চের উপরেই

রবি বলে, বেড়ে ডেঁপো হয়েছিস তো, বড় বড় বুলি ঝাড়ছিস।

শক্তির ভালমানুষি অজয়ের সব সময় ভাল লাগে না। একটু বিরক্তিভরেই সে বলে, সত্যি শক্তি, মাঝে মাঝে তোর লেকচার ভারি বিশ্রী লাগে।

অজয়ের কথায় আহত হয়ে শক্তি বলে, বেশ, আমি আর কিছু বলব না।

শক্তির অভিমান হয়েছে অজয় বোঝে। সে তাই বলে, রাগ করলি?

—না। তোর যা ইচ্ছা কর্। শক্তি অনেক কষ্টে কথাগুলি বলে, অভিমানে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

অজয়কে শক্তির অভিমান ভাঙাবার সময় রবি দেয় না। অজয়ের হাত ধরে টেনে রবি বলে, চল্, চল্, কী তুই করতে চাস আমায় বলবি চল্।

অজয় দোটানায় পড়ে। দুজনেই তার বন্ধু, দুজনকেই সে ভালবাসে। একজন অভিমান করে তাকে ছেড়ে দেয়। আর একজন জোর করে তাকে টেনে নিতে চায়। অজয় ইতস্তত করে।

শেষে রবিই অজয়কে টেনে নিয়ে চলে যায়। শক্তি একা

[illegible] —ছা।

পরস্পরের মধ্যে সৌহ

* * *

এই অনুষ্ঠানে গান-অজয়ের নির্দেশমত রবি অভ্যাগতদের সব

শক্তি পঙ্গু বলে এবং পনে বিছুটি ও আলকুশি ঘষে রাখে।

পোশাকের বাক্সে ও পরচুলা ইত্যাদিতে দুজনে মিলে সবার অজ্ঞাতে ছারপোকা ও লাল পিঁপড়ে ছেড়ে দেয়। নিমন্ত্রিতদের চায়ের জলে ডাক্তারখানা হতে জোলাপ কিনে এনে মিশিয়ে দেয়। কেউ তাদের দুজনকে সন্দেহ করে না, কারণ সবাই অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত। তবে অমূল্য রবিকে হঠাৎ এক সময় স্টেজের তলা থেকে বের হতে দেখে ফেলে।

সে জিজ্ঞাসা করে, কী রে, তুই স্টেজের নীচে কী করছিলি?

রবি প্রথমটায় একটু ঘাবড়ে গেলেও বুদ্ধি করে জবাব দেয়, পয়সা পড়ে গিয়েছিল তাই খুঁজছিলাম।

অমূল্য আসল ব্যাপার মোটেই টের পায় না। রবি এদিকে স্টেজের তলায় একগাদা পটকা রেখে এসেছিল, এদের অভিনয়ের সময়ে সেগুলিতে আগুন লাগিয়ে সব পণ্ড করে দেবার জন্য।

সময় হতেই একে একে নিমন্ত্রিতেরা আসেন। সমরবাবু তাঁদের অভ্যর্থনা করেন, চেয়ারে বসান। কিন্তু চেয়ারে বসেই সকলে ছটফট করেন, গা হাত পা বিষমভাবে চুলকান। এমন কী দু'একজন আসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে চা বিতরিত হয়। যাঁরা চা পান করেন তাঁরা আর বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারেন না। সিড্‌লিস্ পাউডার মেশান গরম চা খাওয়ার একটু পরেই তাঁদের আসন হতে উঠে পড়তে হয়।

হাস্যকর ব্যাপার হয় অভিনয়ের শুরু হতেই। অভিনেতারা ছারপোকা পিঁপড়ার কামড়ে অস্থির হয়ে ওঠে, মঞ্চের উপরেই

প্রকাশ্যে প্রাণপণে চুলকান আরম্ভ করে। বক্তব্য একেবারে ভুলে যায়।

রূপ বেচারী মাথার পরচুলা খুলে ফেলে স্টেজের উপরেই মাথা চুলকায়, তার চুলের মধ্যে ছারপোকা ঢুকে গেছে। তার কাণ্ড দেখে দর্শকবৃন্দ অট্টহাস্য করে। সে বেচারা লজ্জায় জিভ কেটে তাড়াতাড়ি পরচুলা মাথায় পরে বটে, কিন্তু ঘাবড়িয়ে গিয়ে তার বক্তব্য বেমালুম বিস্মৃত হয়। শৈলেন দূত সেজেছিল; দর্শকদের হাসি শুনে আর অন্য অভিনেতাদের অবস্থা দেখে সে আর মঞ্চে প্রবেশ করতে চায় না। প্রম্পটর ভবেনবাবু প্রায় জোর করেই তাকে উইংসের পাশ হতে ঠেলে দেন। দু'পা এগিয়েই সে আবার পিছিয়ে এসে উইংসের পাশে লুকিয়ে পড়ে।

ভবেনবাবুকে সভয়ে বলে, অনেক লোক স্যার, আমার ভয় করছে।

ভবেনবাবু আবার তাকে ঠেলে দেন। বলেন, এগিয়ে গিয়ে বলো, মহারাজ, শত্রু-সেনাপতি পত্র পাঠিয়েছেন।

ভবেনবাবুর ধাক্কায় শৈলেন মঞ্চের বেশ খানিকটা মধ্যে যায়, সেখান হতে পিছিয়ে আর উইংসের আড়ালে লুকান চলে না। অগত্যা উইংসের দিকে ফিরেই সে ভবেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করে, অ্যাঁ—কী বলবো?

দর্শকরা উচ্চ কণ্ঠে হেসে ওঠে। ভবেনবাবু শৈলেনকে স্মরণ করিয়ে দেন, শত্রু-সেনাপতি পত্র পাঠিয়েছেন।

হাসির শব্দের জন্য শৈলেন সবটা শুনতে পায় না। শেষটুকু শুনতে পেয়েই সে সজোরে বলে, পাঠিয়েছে!

আবার সকলে হেসে ওঠে। মহারাজরূপী অমূল্য গা চুলকাতে ব্যস্ত থাকায় দূতের হাত হতে পত্র গ্রহণ করতে পারে না! সেনাপতি নির্মলকে বলে, পড় তো।

পত্রটির মধ্যেও অজয়ের কারসাজি আছে। একখণ্ড বড় কাগজ গুটিয়ে পত্ররূপে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল দূতের জন্য। অজয় এক সময়ে সকলের অলক্ষ্যে দু-তিনটি আরশুলা ধরে এনে পত্ররূপী মোড়কটির মধ্যে পুরে রেখেছিল। দূত পত্রটি গ্রহণ করে এনেছে বটে, কিন্তু ভিতরে কী আছে তা সে জানে না। সেনাপতি পত্রটি খুলতেই আরশুলাগুলি 'ফড়ফড়' করে ওড়া শুরু করে, অভিনেতারা সভয়ে মঞ্চের উপর লাফালাফি শুরু করে দেয়।

ব্যাপার চরমে ওঠে যখন রবি ঠিক এই মুহূর্তে পটকায় আগুন দেয়। ভীষণ শব্দ শুনে মহারাজা সেনাপতি ও সৈন্যবৃন্দ সমস্ত বীরত্ব পরিত্যাগ করে মঞ্চ হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, দূত বেচারা দু চোখ বুঁজে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে।

দর্শকেরাও তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে চেয়ার ইত্যাদি উল্টে ফেলেন। ভীষণ হট্টগোল ও হৈহৈর মধ্যে অনুষ্ঠান ভেঙে যায়। সমস্ত ব্যাপারটা দক্ষযজ্ঞের মত পণ্ড হয়।

রবি কিন্তু ধরা পড়ে যায়। অমূল্য তাকে স্টেজের তলা হতে বেরুতে দেখেছিল একথা হেডমাস্টারকে বলে দেয়।

ফলে পরদিন স্কুলে সমরবাবু রবিকে সকলের সামনে বেত মারেন।

রবিকে নির্মমভাবে মারতে মারতে তিনি বলেন, বলো কেন চায়ে জোলাপ মিশিয়েছো ? কেন পোশাকে ছারপোকা ছেড়েছো ? বলো, বলো—

রবি মুখ বুঁজে মার খায়, কোন জবাব দেয় না। অজয়ের কাছে রবির এই নির্যাতন অসহ্য হয়ে ওঠে; তারই জন্য রবি বেচারা সমস্ত দৈহিক যন্ত্রণা সহ্য করছে, তবু দুষ্কর্মের সাথীর নাম প্রকাশ করছে না। অজয় ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়ে, তার মনে হয় প্রতিটি বেত যেন তারই উপর পড়া উচিত। সমরবাবুর বেত রবির দেহের উপর পড়ে বটে, কিন্তু আঘাত হানে অজয়ের মনে। অজয় বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারে না। ছুটে সামনে এসে রবিকে আড়াল করে দাঁড়ায়। সমরবাবুর বেতের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, ওকে মারবেন না, স্তার। আমিই দোষী। আমিই সব করেছি।

সকলে অবাক হয় অজয়ের আচরণে। সমরবাবুও কম অবাক হন না; তিনি অজয়ের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, So you are the culprit!

অজয়কে কী শাস্তি দেওয়া যায় এ নিয়ে শিক্ষক মহলে আলোচনা হয়।

সমরবাবু বলেন, এমন ছেলের নাম কেটে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত; নইলে ওর জন্য আরও পাঁচটা ছেলে নষ্ট হবে।

অমলবাবু এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন। বলেন, দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

ব্রজেনবাবু বলেন, স্কুলের সুনাম সে যে-ভাবে নষ্ট করেছে তাতে তাকে কোনমতে ক্ষমা করা চলে না। তবু যদি বুঝতাম ছেলেটার কোন সদ্‌গুণ আছে। পড়াশুনায় কিচ্ছু না, এদিকে বদমাইশিতে ষোল আনা!

ভবেনবাবু ব্রজেনবাবুর কথায় মৃদু প্রতিবাদ করেন। বলেন, ছেলেটা কিন্তু খেলাধূলায় বেশ ভাল। স্কুলের হয়ে অনেক ট্রফি সে জিতে এনেছে।

শান্তিবাবু প্রায় ধমক দিয়েই বলেন, আপনি থামুন, ভবেনবাবু! স্কুলটা ক্লাব নয় যে খেলায় ভাল বলেই তাকে স্কুলে রাখতে হবে। এটা বিদ্যালয়, খেলার মাঠ নয়।

পণ্ডিতের একথাটি খুব মনঃপূত হয়। বলেন, আজকাল কেন যে স্কুলে ড্রইং আর ড্রিল শেখানো হয় জানি না। ড্রইংয়ের ফলে বোর্ডে শিখা সমেত ছবি আর ড্রিলের ফলে পিছন হতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে দ্রুত পলায়ন। এই তো হচ্ছে শিক্ষা! ছিঃ ছিঃ—

শিশির এতক্ষণ চুপ করে সকলের কথা শুনছিল। অজয়ের বিরুদ্ধে সকলে যেরূপ উত্তেজিত হয়ে রয়েছে তাতে সে নিজের মতামত প্রকাশ করতে একটু দ্বিধা করছিল। অজয়ের অপরাধ যাতে সকলে নিরপেক্ষভাবে বিচার করে সেজন্যে সে বলে, আমি একটা কথা বলতে পারি?

সমরবাবু বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন না!

শিশির ধীরে ধীরে বলে, আমার সহকর্মীরা যাঁরা খেলাকে আর পড়াকে আলাদা করতে চান আমার মনে হয় তাঁরা ভুল করছেন। ছেলেটা খেলাধূলায় ভাল এ গুণটা আপনারা ধর্তব্যের মধ্যেই আনতে চান না। বেশ! কিন্তু আর একটা সদ্‌গুণও কি আপনাদের চোখে পড়ল না?

শিশিরের প্রশ্নে সব শিক্ষকেরা পরস্পরের মুখের দিকে চান। পড়াশুনায় রীতিমত খারাপ, ভয়ংকর দুষ্টু ছেলে; তার আবার সদ্‌গুণ কী?

শিশির অজয়ের গুণগুলির কথা বলে, অপরাধ করে শাস্তি-গ্রহণের সাহস, বন্ধুপ্রীতি, সত্যবাদিতা, এগুলি আমায় অবাক করেছে। ছেলেটার সদ্‌গুণ একেবারে নেই একথা মিথ্যা। তাছাড়া ওর বুদ্ধির কথাটাও একবার ভেবে দেখুন! একটার পর একটা যে সব দুষ্টুমি ও করেছে তার চমৎকারিত্ব, তার উদ্ভাবনী শক্তি অতুলনীয়। আমি ভাবছি ওর ওই দুষ্টবুদ্ধির যদি কোন রকমে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে একটা বিস্ময়কর ফল পাওয়া যাবে।

পণ্ডিতমশাই শিশিরের সব কথা নস্যাৎ করে বলেন, অঙ্গারঃ শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।

শিশির বলে, অঙ্গারের উপমা দিয়ে তাহলে আমিও বলি। অঙ্গার ধুলে পরিষ্কার হয় না বটে কিন্তু জ্বালালে লাল হয়। আগুনে সব মলিনতা মুছে যায়। দুষ্টু ছেলের পরিবর্তনেরও

নিশ্চয় উপায় আছে। প্রক্ষালন নয়, অগ্নিশুদ্ধির প্রয়োজন ওর। বলা যায় না অকস্মাৎ কোথায় কি ভাবে কোন আদর্শের জোরে কোন মানসিক আঘাতের ফলে ওর জীবনের ধারা বদলে যেতে পারে!

সমরবাবু জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কী বলতে চান, শিশিরবাবু?

—আমি বলতে চাই এইরকম একটি বুদ্ধিমান ছেলেকে নাম কেটে তাড়িয়ে দিলে অন্যায় করা হবে। ছেলেরা born crimi-nal নয়; তারা ভাল হয় ভাল শিক্ষার গুণে। সব দেশেরই দুষ্ট ছেলেরাই বিখ্যাত হয়েছেন পরবর্তী জীবনে।

সমরবাবু বলেন, ধরুন সৎশিক্ষা পেয়েও যদি ওর পরিবর্তন না হয়!

শিশির বলে, তখন আমি ওকে সবার থেকে আলাদা করে নিয়ে মানসিক বিকারগ্রস্ত ভেবে উপযুক্ত ব্যবস্থা করবো।

শিশিরের কথাগুলি সমরবাবু বিবেচনা করেন। বলেন, বেশ, আপনি যখন বলছেন তখন আর একটি সুযোগ ওকে দেওয়া যাবে; তবে এটাই শেষ সুযোগ।

ছেলেরা টের পায় শুধু শিশিরের জন্য অজয়কে এবার স্কুল থেকে তাড়ান হলো না; তার সমস্ত অপরাধ শিক্ষকেরা ক্ষমা করেছেন। অজয়ের সারা মন শিশিরের উপর কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। ইচ্ছা করে শিশিরকে গিয়ে একটা প্রণাম করতে, কিন্তু

লজ্জা ও সংকোচের জন্য তা সম্ভব হয় না। অজয়ের মনের কথা মনেই থেকে যায়।

শক্তির একটা কথা অজয়ের খুব মনে ধরে। সত্যি, এবার থেকে মন দিয়ে লেখাপড়া না করলে শক্তির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবে। শক্তি পরীক্ষার পর পাস করে উঁচু ক্লাসে উঠে যাবে আর সে পড়ে থাকবে। ফেল্ করার লজ্জার সঙ্গে থাকবে শক্তিকে হারানোর বেদনা। শক্তির সঙ্গে বরাবর থাকার জন্য তাকে পরীক্ষায় পাস করতে হবে, পড়তে হবে।

তবে এবার হতে পড়াশোনায় মন দিয়ে ভাল ছেলে হলেও অমূল্যকে একবার মজা দেখাতে হবে। অমূল্যর চুক্লি করার জন্য রবি মার খেয়েছে, তাকে স্কুল থেকে তাড়ানো হচ্ছিল। অমূল্যকে সহজে ক্ষমা করা হবে না। অমূল্যর উপর ভীষণ রাগ আর ঘৃণায় অজয়ের মন ভরে থাকে।

এই রাগ আর ঘৃণা ভয়ানক ভাবে প্রকাশিত হয় সেদিন খেলার মাঠে। ফুটবল খেলতে নেমে দুর্ভাগ্যক্রমে অজয়ের দল একটা গোল খায়। অমূল্য অজয়ের বিপক্ষে খেলছিল; গোল হওয়ার পরে সে অজয়ের সামনে এসে দুহাতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে কলা দেখিয়ে নেচে ওঠে। অজয় সংকল্প করে অমূল্যর বিদ্রূপের শোধ সে নেবে একাই তিনটি গোল দিয়ে। অজয় প্রাণপণ করে খেলে, পর পর দুটি গোল সে দেয়। মাঠের সমস্ত ছেলেরা সানন্দে অজয়কে উৎসাহিত করে। অজয়ের এই কৃতিত্ব অমূল্য

সহ্য করতে পারে না। এরপর অজয় যখন আবার বল নিয়ে এগিয়ে আসে অমূল্য তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দেয়।

অজয় উঠে দাঁড়িয়ে বলে, টেক্ কেয়ার, অমূল্য!

অমূল্য অবজ্ঞা ভরে বলে, তুই টেক্ কেয়ার!

অজয় রেগে বলে, বটে? আচ্ছা!

এরপর বল নিয়ে অজয় ও অমূল্য যখন মুখোমুখি হয়, অজয় তখন বল ছেড়ে অমূল্যর পেটে সজোরে লাথি মারে। অমূল্য জ্ঞান হারিয়ে ঘুরে পড়ে। রেফারী শিশির খেলা বন্ধ করে ছুটে আসে। ছেলেদের ভিড় সরিয়ে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস প্রক্রিয়া দ্বারা অমূল্যর জ্ঞান ফিরিয়ে আনে।

শিশির অজয়কে জিজ্ঞাসা করে, ওকে ও রকমভাবে মারলে কেন?

অমূল্যর উপর অজয়ের রাগ তখনো যায়নি। সে বলে, ওর শিক্ষার দরকার।

অজয়ের কথায় শিশির রেগে ওঠে। বলে, তাই তুমি শিক্ষা দিতে এসেছো? বেরিয়ে যাও মাঠ থেকে। ছেলেরা, তোমরা কেউ ওর সঙ্গে কথা বলবে না।

শিশির ভাবে অপরাধ করে যে অনুতপ্ত হয় না তাকে সকলের পরিত্যাগ করাই উচিত। তবেই অপরাধীর চেতনা হবে।

অজয় আস্তে আস্তে খেলার মাঠ হতে বেরিয়ে যায়। তার সারা মন অভিমানে ভরে ওঠে। যত দোষী যেন সেই; অমূল্যর অপরাধ কেউ দেখল না। চিরদিন তাকে দুষ্টু ছেলে বলে বড়

অন্যায়ের মূল ভেবে সবাই বিচার করবে? তাকে যারা বরাবরই ভুল বুঝবে তাদের মধ্যে থেকে লাভ কী? অভিমানে দুঃখে অজয়ের কান্না পায়। সে ভাবে এইবার সে যাচাই করে দেখবে কে তাকে কতখানি ভালবাসে।

হস্টেলে ফিরে অজয় রবিকে ডাকে, রবি! শোন—

রবি দেখে অন্যান্য ছেলেরা লক্ষ্য করছে সে শিশিরের আদেশ উপেক্ষা করে অজয়ের ডাকে সাড়া দেয় কিনা। রবি মহা মুশকিলে পড়ে। অনেক ইতস্তত করে সে বলে, স্যার বারণ করেছেন, ভাই।

রবির ব্যবহারে অজয় ব্যথা পায়। রবি—তার দুঃসাহসিক কাজের সঙ্গী রবি—সে পর্যন্ত তাকে ত্যাগ করেছে। অজয়ের বন্ধুত্বের চেয়ে শেষে শিশিরের বাক্যই বড় হলো রবির কাছে? ছাত্রমহলে শিক্ষক শিশিরই আজ সবচেয়ে বড় হলো? আর তাদের সর্দার অজয় আজ কেউ নয়? এ অজয় কখনোই সহ্য করতে পারবে না। ছেলেমহলে চিরদিনের নেতা সে। রামগরুড়ের কর্তৃত্ব সে খতম করেছে, অমূল্যর চালাকি সে ঠাণ্ডা করেছে। আর আজ শিশিরের কাছে হার মানবে? দেখবে শিশিরের কথার অবাধ্য হয়ে কেউ তার সঙ্গে কথা বলে কিনা।

অজয় ছুটে আসে শক্তির কাছে। বলে, শক্তি, তুইও আমায় বয়কট করেছিস?

অজয়ের প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে বুদ্ধিমান শক্তি বলে, ভাল হলে কেউ তোকে বয়কট করবে না।

—আগে বল্ তুই বয়কট করেছিস কিনা? সহজে ছাড়বার ছেলে নয় অজয়। শক্তি অজয়কে সত্যি ভালবাসে এবং সে বোঝে শিশির যা আদেশ দিয়েছে তা অজয়ের ভালর জন্য। অজয়ের সঙ্গে কথা না বলা তার পক্ষে কষ্টকর হলেও শিশিরের আদেশ লঙ্ঘন করা উচিত নয়। তাই সে আবার বলে, তুই ভাল হ, অজয়!

—দুত্তোর ভাল হও, ভাল হও—কেবল ঐ এক কথা।

অজয়ের দুঃখ অভিমান সমস্তই পরিণত হলো রাগে। শক্তিও তাকে ভুল বুঝে অন্য সব ছেলেদের দলে গেল। উত্তেজিত হওয়ার জন্য অজয় একবারও ভাবল না যে সে শক্তিকে ভুল বুঝছে কিনা।

অজয় শক্তিকে বলে, শুধু আমার দোষটাই দেখলি! ভেবে-ছিলাম সকলে বয়কট করলেও তুই বয়কট করবি না। যাক সে ভুল আমার ভেঙে গেল। তুইও শুনে রাখ—তোর সঙ্গে আমার এই শেষ—

উত্তেজিত ভাবে হন্ হন্ করে অজয় স্থানত্যাগ করে। হস্টেল ছেড়ে যে দিকে দুচোখ যায় সে চলে যাবে।

শক্তি ডাকে, অজয়, শোন্! শোন্! আমার কথা শুনে যা—

কোন কথায়, কারও কথায় অজয় কান দেবে না। কেউ তাকে ভালবাসে না, সবাই তাকে ত্যাগ করেছে।

শক্তি অজয়কে অনুসরণ করে। অজয়ের পিছু পিছু সেও হস্টেল ছেড়ে রাস্তায় এসে পড়ে। ডাকে, শুনে যা, অজয়—

অজয় পিছনে ফিরেও চায় না। শক্তি তাকে মিছিমিছিই ডাকছে। শক্তি তার বন্ধু নয়। শক্তি ভাল ছেলে। সে দুষ্ট ছেলে। চিরদিন সবাই তাকে ধমকেছে, মেরেছে, শাসন করেছে। কেউ তাকে ভালবাসে না। সে একা! বেদনায় তার চোখদুটি ঝাপসা হয়ে ওঠে। সকলের কাছ হতে সে দূরে চলে যাবে···তার গতি দ্রুত হয়···

পাগলের মত অজয় কোথায় ছুটে চলেছে? আচ্ছা পাগল তো! এ কী ছেলেমানুষি সে করছে? শক্তি তার সঙ্গে সমতালে চলতে পারে না। পঙ্গুতার জন্য পিছিয়ে পড়ছে। তার প্রাণপণ চেষ্টা সে করে। অজয়কে ফিরিয়ে আনতেই হবে। সে ডাকে, অজয়, ফিরে আয়! ফিরে আয়, অজয়—

আশপাশের সব কিছু শক্তি ভুলে যায়; ভুলে যায় যানবাহন-সংকুল রাজপথে সে হাঁটছে। ভুলে যায় গতিশীল মোটরগাড়িগুলির কথা। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ দূরে অপসৃয়মাণ অজয়ের প্রতি····অভিমানী বন্ধু সন্ধ্যার জনতার ভিড়ে না হারিয়ে যায়···

অজয়ের দিকে চোখ রেখে রাস্তা পার হতে গিয়ে পিছনে তীব্র হর্ন শুনে শক্তি হঠাৎ চমকে ওঠে। তাড়াতাড়ি দ্রুতগামী গাড়ির পথ ছেড়ে দিতে গিয়ে তার 'ক্র্যাচ' পিছলে যায়। শক্তি পথের উপর পড়ে যায়। মোটর চালক যথাসাধ্য ব্রেক করেও

গাড়ির গতিরোধ করতে পারে না। মুহূর্তের মধ্যে শক্তি চাকার তলায় চলে যায়। তীব্র ব্রেকের শব্দে আর আর্তনাদে পথচারীরা সবাই সচকিত হয়ে উঠে ছুটে আসে।

অজয় চমকে পিছনে চায়। চীৎকার করে সে ছুটে আসে।

অচেতন আহত শক্তির দেহ গাড়ির তলা হতে টেনে বের করা হয়। রক্তে তার সর্বাঙ্গ প্লাবিত। সুন্দর সুকোমল দেহের অবস্থা যা হয়েছে সে বীভৎসতার বর্ণনা করা চলে না।

অজয় শক্তিকে আঁকড়ে ধরে কাঁদে। বলে, তুই কেন ফেরাতে এসেছিলি···কেন আমায় ফেরাতে এসেছিলি ?

হাঁসপাতালের ইমার্জেন্সি ওআর্ডে শিশির ও হস্টেলের অন্যান্য ছাত্ররা উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করে ডাক্তারের রিপোর্টের জন্য। খবর পেয়ে শক্তির মাও ছুটে এসেছেন; সকলের থেকে একটু দূরে স্থাণুর মত তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন। অজয়ের চোখে জলের ধারা, সর্বাঙ্গে রক্তের ছিটা।

গম্ভীর মুখে কেবিন হতে বেরিয়ে ডাক্তারবাবু জানান, জ্ঞান হয়তো শেষ মুহূর্তে একবার ফিরে আসতে পারে। ইচ্ছা করলে আপনারা দু'একজন রাত্রে কেবিনে থাকতে পারেন।

শিশির ঠিক করে শক্তির মার সঙ্গে সে কেবিনে থাকবে। অজয় সাশ্রু নয়নে শিশিরকে বলে, আমিও থাকবো স্তার আপনাদের সঙ্গে।

রাত্রে শক্তির বিছানার পাশে বসে থাকে তার মা, শিশির ও অজয়। এক সময় ধীরে ধীরে শক্তির জ্ঞান ফিরে আসে; ঠোঁট দুটি অল্প ফাঁক হয়। তিন জনে ঝুঁকে পড়ে শক্তির দেহের ওপর।

মা বলেন, খোকা!

অজয় ডাকে, শক্তি!

শিশির জিজ্ঞাসা করে, কিছু বলছো?

শক্তি চোখ মেলে চায়। আস্তে আস্তে বলে, বড্ড কষ্ট।

জল দিতে ডাক্তারবাবু বারণ করেছেন। বলেছেন জ্ঞান ফিরে এলে তাঁকে খবর দিতে।

শিশির ঘরে উপস্থিত নার্সকে বলে, ডাক্তারবাবুকে খবর দাও।

নার্স তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। শিশিরও তাকে অনুসরণ করে।

শক্তির এই দুর্ঘটনার জন্য অজয় নিজেকে দায়ী বলে মনে করে। এতক্ষণ অনুশোচনার গ্লানিতে তার মন দগ্ধ হচ্ছিল। শক্তির জ্ঞান ফিরে আসায় সে তার কাছে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ পায়। বলে, শক্তি, তুই আমায় ক্ষমা কর ভাই।

অজয়ের কথায় শক্তি মৃদু হাসে। দুর্ঘটনার জন্য অজয় দায়ী নয়, তার কোন দোষ নেই। মনের কথা মুখের হাসিতে সে প্রকাশ করে।

অজয় কিন্তু শান্ত হয় না। শক্তির একটি হাত মুঠির মধ্যে নিয়ে সে বলে, তুই আমায় ভুল বুঝিস নি, শক্তি। আমি আর দুষ্টুমি করবো না। আমি ভাল হবো, খুব ভালো হবো। তুই তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ্, ভাই।

মা মৃদুকণ্ঠে ডাকেন, খোকা!

—মা!

—কষ্ট হচ্ছে, বাবা?

অনেক কষ্টে শক্তি উচ্চারণ করে, শুধু তোমাকে আর অজয়কে ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে।

দীর্ঘশ্বাস টানতে টানতে কথাগুলি শক্তি বলে। কপালে তার বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে। শারীরিক যন্ত্রণা তার চেতনাশক্তি লুপ্ত করে আনে।

মার চোখের সামনে ঘনিয়ে আসে ছেলের মৃত্যু মুহূর্ত। শোকে বেদনায় তাঁর বুদ্ধি লোপ পায়। আকুল স্বরে তিনি ডাকেন, খোকা। খোকা!

শক্তির বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে অজয় কাঁদে। বলে, আমি তোকে ছেড়ে যেতে দেবো না! আমি তোকে যেতে দেবো না!

শক্তি মারা যাচ্ছে একথা কেমন যেন মার মাথায় ঢোকে না। তাঁর খোকা এমন হঠাৎ কেন মারা যাবে? এ যে অসম্ভব! বিশ্বাস করতে পারা যায় না। একথা যে তিনি কোন দিন ভাবেন নি। তাঁর ছেলে বড় হবে, মানুষ হবে, সব দুঃখ দূর করবে—এ যে তাঁর চিরদিনের আশা, বরাবরের বিশ্বাস। 'আমি বড় হয়ে তোমায় আর চাকরি করতে দেবো না, মা' একথা যে এখনো তাঁর কানে বাজছে।

সস্নেহে তিনি ছেলের সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দেন। অত্যন্ত চিন্তিত থাকায় টের পান না শক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে, চোখের পলক আর পড়ছে না।

ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে শিশির ও নার্স ফিরে আসে। ডাক্তার শক্তিকে পরীক্ষা করে বলেন, জল আর ও খাবে না।

বিচলিত মানসিক অবস্থার জন্য ডাক্তারবাবুর কথা মা বুঝতে পারেন না। শুধু জল শব্দটি তাঁর কানে ঢোকে। তাড়াতাড়ি বলেন, জল? জল আমি দিচ্ছি খেতে।

খাওয়ার কথা হতে তার মনে আসে রান্নার কথা, মনিব বাড়ির কথা, চাকরির কথা। আপন মনেই তিনি বলেন, রান্না আমার হয়ে গেছে। আর দেরি নেই। আমি যাচ্ছি....আমি যাচ্ছি।

তিনি ভুলে যান তাঁর ছেলে মারা গেছে। ভুলে যান পারি-পার্শ্বিক অবস্থা। তাড়াতাড়ি ঘর হতে বের হতে যান।

ডাক্তারবাবু তাঁর অবস্থা দেখে নার্সকে বলেন, নার্স! ওঁকে ধরো—ওঁকে ধরো। এক্ষুনি হিস্টিরিক ফিট হবে।

মার মুহ্যমান অবস্থা দেখে শিশির কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। অজয় বন্ধুর বুকে মুখ গুঁজে কাঁদে।

শক্তি মারা যায়, আর তার মা পাগল হয়ে যান।

দুর্ঘটনায় শক্তির এই আকস্মিক মৃত্যু সকলকেই ব্যথিত করে। স্কুলে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। অজয়ের জোর করে তোলানো সেই ছবি বড় করিয়ে দেয়ালে টাঙানো হয়। স্কুলের পক্ষ হতে সমরবাবু ছবিতে মালা পরান।

বিষণ্ণ কণ্ঠে তিনি বলেন, শক্তি যে আর নেই, এটা বিশ্বাস হয় না। এখনো মনে হচ্ছে সে হাসি মুখে কোথাও তোমাদের মাঝেই হয়তো লুকিয়ে আছে। আজ মনে পড়ছে ক'বছর

আগের কথা! ফুটফুটে এতটুকু ছেলে বল্লে, মা আমার গরিব, আমায় কি আপনি পড়তে দেবেন আপনার স্কুলে? মাইনে দিতে পারবো না, কিন্তু যা বলবেন তাই করবো। বলেছিলাম ক্লাসে ফার্স্ট হতে পারবে? তাহলে মাইনে লাগবে না। হেসে সে বল্লে, বেশ স্যার, তাই হবে। নাহলে তাড়িয়ে দেবেন স্কুল থেকে। সে তার কথা রেখেছিল বরাবর ক্লাসে প্রথম হয়ে। কত আশা করেছিলাম আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষায় ওই আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে। কিন্তু সে অকালে চলে গেল এই গুরুদায়িত্ব তোমাদের উপর দিয়ে।

সমরবাবুর বক্তৃতা অজয় বেশীক্ষণ শুনতে পারে না। কথা-গুলি যেন তার ব্যথার স্থানে খোঁচা মারে। সবার অলক্ষ্যে সে সভা ত্যাগ করে সজল চোখে। ধীরে ধীরে হস্টেলের পিছনের বাগানে আসে। মনে পড়ে প্রথম দিনের কথা…'তাহলে আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু'….মনে পড়ে বন্ধুর শেষ অনুরোধ—'তুই ভাল হ, অজয়'….

অতি পরিচিত দোলনাটির কাছে এসে অজয় দাঁড়ায়। দোলনাটি যার সে আর কোনদিন এতে চাপবে না। এর ওপর জমবে ধূলা, গাছ হতে ঝরা পাতা। অজয় আস্তে আস্তে দোলনাটিতে বসে ভাবে। শক্তির শূন্য স্থান সে কি পূরণ করতে পারবে? এই দোলনা…ঐ স্কুলের প্রথম স্থান…দুঃখিনী মায়ের কোল…

অজয় মনে মনে অনেক কিছু সংকল্প করে, অনেক কিছু শপথ করে।

রাত্রে অজয় ঘুমাতে পারে না। সব সময় শক্তির কথা তার মনে পড়ে। ঘুমের মাঝে যেন শোনে শক্তির স্বর—অজয়! এখনো শুয়ে রয়েছো! ওঠো, বই খুলে বসো…

অজয় ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। বোঝে মনের ভুল। কিন্তু তা সত্ত্বেও চুপচাপ শুয়ে থাকতে আর সে পারে না। শক্তিকে যে সে কথা দিয়েছে ভাল হবে, তাকে পড়াশোনা করতেই হবে। গুরু দায়িত্ব সে মনে মনে গ্রহণ করেছে।

অজয় তাক হতে বই টেনে নেয়। আলো জ্বালাতে গিয়ে মনে হয় এত রাত্রে তাকে পড়তে দেখলে শৈলেন-নির্মল কী মনে করবে! একটু লজ্জা হয়। চুপি চুপি একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে সে বইয়ে মনোনিবেশ করে।

রাত্রে শিশিরও ঘুমাতে পারে না। ছাত্রাবাসের একটি ভাল ছেলে এরকম ভাব মারা যাওয়ায় তার মনটাও খুব খারাপ হয়ে গেছে। অজয় যেমন মনে করছে শক্তির মৃত্যুর জন্য সে দায়ী, তেমনি শিশিরও মনে করে শক্তির মৃত্যুর জন্য আংশিক দায়ী সেও। অজয়কে ফেরাতে গিয়ে শক্তি মারা গেছে। অজয়ের হস্টেল ত্যাগ করতে যাওয়া অন্যায় হয়েছে। শিশিরেরও অন্যায় হয়েছে অজয়কে হস্টেল ত্যাগ করতে বাধ্য করা। কেন সে সব ছেলেকে বলেছিল অজয়কে পরিত্যাগ করতে? তার মত স্থির-মস্তিষ্কের লোক কেন একটি ছেলেকে এমন চরম শাস্তিদান করেছিল! অজয়ের অপরাধের চেয়ে তার উত্তেজনা বেশী হয়েছিল। প্রকৃত বিচার না করে সে অজয়কে শাস্তি দিয়েছে।

অজয়কে ধৈর্য ধরে তার বোঝান উচিত ছিল। নিজেকে অপরাধী বলে শিশিরের মনে হয়। শিশির ভাবে অজয়ের কাছে তাঁর অন্যায় স্বীকার করা উচিত।

এই ধরনের চিন্তা শিশিরের মনকে আলোড়িত করে। সহজে ঘুম না আসায় সে ঘরের বাইরে আসে বারান্দার খোলা হাওয়ায় একটু পায়চারি করে মনকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে।

হঠাৎ তার নজরে পড়ে অজয়ের জানলার কাছে যেন মৃদু আলো জ্বলছে। এত রাত্রে আলো জ্বেলে কে কী করছে দেখার জন্য শিশির অজয়ের ঘরে আসে। দেখে অজয় একমনে মোটা বই সামনে খুলে কী যেন লিখে চলেছে। এত রাত্রে সকলের অগোচরে কী এমন গোপন কথা অজয় লিখছে? শিশির নিঃশব্দে অজয়ের পিছনে এসে দাঁড়ায়, দেখে বীজগণিত হতে সে অঙ্ক কষছে। শিশির অঙ্কটা লক্ষ্য করে, দেখে বারবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও অজয় ভুল করছে। অনভ্যাসের জন্য সঠিক ফর্মুলা স্মরণ করতে না পারায় ভুল হচ্ছে। শিশির আস্তে আস্তে তার হাত হতে পেন্সিলটা টেনে নেয়। অজয় চমকে উঠে পিছনে চেয়ে শিশিরকে দেখে একটু অবাক হয়। শিশির অজয়ের কোথায় ভুল হচ্ছে দেখিয়ে অঙ্কটি কষে দেয়।

নিজের ভুল দেখে অজয় একটু লজ্জা পেয়ে হাসে।

শিশির বলে, আর ভুল হবে না তো?

—না, স্যার। একটু ইতস্তত করার পর অজয় বলে, আমায় সব পড়াগুলো আপনি একটু বুঝিয়ে দেবেন?

—বেশ তো। তবে আজ অনেক রাত হয়েছে, এখন শুয়ে পড়ো। কাল হতে আমরা একসঙ্গে পড়বো কেমন ?

একটু দ্বিধা ভরে অজয় বলে, চেষ্টা করলে আমি ফার্স্ট হতে পারবো না, স্যার ?

—নিশ্চয়ই পারবে। শিশির তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস এনে দেয়।

ছেলেমানুষের মত অজয় বলে, আমায় স্যার আপনি ফার্স্ট করে দেবেন।

—আপনা হতেই ফার্স্ট হতে হবে, কেউ করে দিতে পারবে না। আমরা শুধু তোমায় প্রয়োজনমত সাহায্য করবো।

অজয়ের চেষ্টা আর শিশিরের সাহায্যের ফল পাওয়া গেল বাৎসরিক পরীক্ষায়। অজয় প্রথম হয়েছে। সবাই অবাক হয়ে যায়। আরও অবাক হয় পুরস্কার-বিতরণী সভায় যখন স্কুলের সেক্রেটারি ও ইন্সপেক্টর শিশিরের কর্মকৃতি উল্লেখ করে তার আসল পরিচয়টি প্রকাশ করে দেন।

সেক্রেটারি জানান যে এই স্কুলের ছাত্ররা বিভিন্ন প্রতি-যোগিতায় জয়লাভ করে জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে; লেখাপড়ায় ও খেলাধূলায় এখানকার ছাত্ররা সমান পারদর্শী। তাছাড়া তারা স্বেচ্ছাসেবকরূপে বিভিন্ন জনহিতকর কার্যের মধ্যে দিয়ে ছাত্রসমাজের সম্মুখে যে আদর্শ তুলে ধরেছে তা অন্যদের অনুসরণীয়। অজয় ও অন্যান্য ছাত্রদের কৃতিত্বের পশ্চাতে যাঁর প্রচ্ছন্ন আন্তরিক পরিশ্রম রয়েছে তিনি হচ্ছেন

আমাদের সুধী বন্ধু শ্রীশিশির আচার্য। ছেলেদের শিক্ষাদানের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তিনি বরাবরই চিন্তা করছেন এবং পথের সন্ধানও পেয়েছেন। আরও কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যই তিনি নিজের আসল পরিচয় গোপন করে এখানে থাকেন।

শিশিরের সহকর্মীরা এ কথায় অবাক হন। পণ্ডিতমশাই লজ্জা পান, এই শিক্ষাব্রতীর বিরুদ্ধে তিনি ষড়যন্ত্র করছিলেন তাঁর প্রচেষ্টাকে পণ্ড করার জন্য।

ইন্সপেক্টর ঘোষণা করেন, শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন বা উন্নতি করতে হলে একটি মাত্র স্কুলে একক প্রচেষ্টায় বিশেষ কিছু সম্ভব নয়। কর্মক্ষেত্র সেখানে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের এই বিষয়ে উৎসাহের ও সাহায্যের প্রয়োজন। যাহোক, শিশিরবাবুর কর্মদক্ষতায় ও তাঁর পরিকল্পনার পিছনে আমাদের সকলের সমর্থন থাকায় শিক্ষাদপ্তর শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধীয় গুরুতর কাজের ভার তাঁর উপর দিতে ইচ্ছুক। এটা অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ।

সকলে সানন্দে হাততালি দেয়। এ কথায় ছাত্ররা কিন্তু আনন্দ পায় না, তাদের কাছে এটা মর্মান্তিক সংবাদ।

রূপ বলে, সে কী রে! স্যার আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন?

রবি বলে, দূর! তাহলে আর পড়াশোনায় মনই লাগবে না।

অজয় কোন কথা বলে না। আনন্দ আর দুঃখে তার মন ভরে ওঠে। প্রথম হওয়ার প্রাইজ পাওয়ার আনন্দ, তার শপথের সার্থকতা, পরিশ্রমের সাফল্য সবই চাপা পড়ে যায় [illegible]

শক্তির অভাবে আর শিশিরের চলে যাওয়ার সংবাদে। সবার অলক্ষ্যে সে সভা ত্যাগ করে।

সভা ভাঙলে শান্তিবাবু চুপি চুপি শিশিরকে বলেন, আমাদের ভুলবেন না। আপনি তো বড় হয়ে যাচ্ছেন, পারেন তো আমাদের মাইনে বাড়াবার একটা ব্যবস্থা করবেন।

শিশির হেসে তাঁর হাত দুটি জড়িয়ে ধরে বলে, আপনাদের কোনদিনই ভুলবো না। শুধু ছাত্রদের ভাল করা নয়, আপনাদের অভাব অভিযোগ দূর করাও আমার ব্রত।

নির্জন হলে শক্তির ফটোর সামনে চুপি চুপি একা অজয় এসে দাঁড়ায়। গলায় ঝুলছে একরাশ মেডেল, হাতে একগাদা বই। সজল চোখে শক্তির ছবির দিকে সে চায়। শক্তির সহাস্য আননের দিকে চেয়ে অজয়ের মনে পড়ে যায় তার স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বরের সেই কথা—সত্যি অজয়, তুই যেদিন খেলাধুলার মত লেখাপড়াতেও প্রাইজ পাবি সেদিন কী আনন্দই হবে!

অজয়ের বুকের মধ্য হতে গুমরে ওঠে এতদিনের চাপা কান্না। ধরা গলায় মনের কথা সে বলে, শক্তি! দেখ, আজ আমি ফার্স্ট হয়ে প্রাইজ এনেছি। কথা রেখেছি। আজ তুই থাকলে কত আনন্দ পেতিস।

অজয়ের দু'চোখ হতে জলের ধারা নেমে হাতে-ধরা বইয়ের মলাটের উপর পড়ে।

সভার শেষে শিশির অজয়কে খুঁজছিল অভিনন্দন জানাবার

জন্য। সে হলে এসে উপস্থিত হয়। নীরবে অজয়ের পিছনে দাঁড়ায়। কবিগুরুর বাণী যে কত সত্য তা উপলব্ধি করে—

নয়নের জল গভীর গহনে আছে হৃদয়ের স্তরে,
বেদনার রসে গোপনে গোপনে সাধনা সফল করে।

শিশির বোঝে বেদনাই মানুষকে মহৎ করে। একটা বড় পরিবর্তনের পশ্চাতে শুধু পদ্ধতি থাকে না, থাকে একটা মহৎ বেদনার নির্মম স্পর্শ।

অজয় শক্তিকে চুপিচুপি শোনায়, শক্তি! তোর কাছেও একটা কথা কোনদিন বলতে পারিনি। মুখ ফুটে কারুর কাছেই বলিনি স্যারকে সত্যি আমি মনে মনে কত ভালবাসি, কত ভক্তি করি। আজ শুধু তাঁর জন্য আর তোর জন্য আমি নতুন মানুষ হয়েছি। তুই চলে গেছিস, স্যারও চলে যাবেন। তোরা কী সবাই আমায় ছেড়ে চলে যাবি রে ?

শিশির আস্তে আস্তে অজয়কে বুকে টেনে নেয়। সস্নেহে চোখের জল মুছিয়ে বলে, আমি যাচ্ছি, কিন্তু মন তো তোমাদের কাছেই পড়ে থাকবে। আনন্দের দিনে, যাবার দিনে চোখের জল ফেলতে নেই।

অজয়ের হাত হতে প্রাইজের বইগুলি পড়ে যায়, দুহাতে সে শিশিরকে আঁকড়ে ধরে বলে, আপনি চলে যাবেন না স্যার— আপনাকে যেতে দেবো না।

কান্নায় অজয়ের কণ্ঠ বুঁজে আসে, সে ফুঁপিয়ে ওঠে।

শিশির অজয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, দুষ্টু ছেলে।